মৃণাল গুপ্ত

চিত্ররেখা গুপ্ত

করকমলেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের

নিশিলতা	মায়ামৃদঙ্গ
আনন্দমেলা	রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র
স্বপ্নের মতো	টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
কালো বাক্সের রহস্য	ভয়-ভুতুড়ে
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ	কালো মানুষ নীল চোখ
বনের আসর	হাড়িম রহস্য
নিঝুম রাতের আতঙ্ক	সবুজ বনের ভয়ঙ্কর

বসন্ততৃষ্ণা

বেন্দা এবং দুই আইন রক্ষক

বেন্দা গ্রীষ্মের দুপুরে নদীর ধারে একটা গাছের ডালে চিত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। সেই সময় বাঁশবনের ভেতর থেকে চাপা গলায় কথা বলতে বলতে দুজন আইনরক্ষক গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

প্রথম আইনরক্ষকের নাম জগদীশ। সে বলল, অনেক হাঁটা হল। এবার একটু বসা যাক্ উপেন্দ্র।

দ্বিতীয় আইনরক্ষক উপেন্দ্র নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে বলল, উরে ববাস! কী রোদ্দুর! এতক্ষণ কিছু বুঝতে পারিনি।

জগদীশ ছায়াঢাকা নগ্ন মাটিতে বসে পড়ল। বেটন দিয়ে উর্বর [illegible] মাটির ওপর দাগ কাটতে কাটতে বলল, পারবে কেন? কেমন ঠাণ্ডা [illegible] আরামে কাটিয়ে এলে। আমি শালা চুলপাকা বুড়ো।

সে হাসতে লাগল। উপেন্দ্র বসল না। ঢোলা হাফ পেন্টুলের পকেট থেকে সুন্দর রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। বাঁকা হেসে বলল, ব্যাটা মেয়েটাকে [illegible] কোত্থেকে [illegible] এনেছে। বুঝলে জগাইদা?

কেন, কেন? জগদীশের চোখ নাচতে থাকল।

উপেন্দ্র বলল, তুমি তো নতুন লোক। আমার [illegible] হয়ে গেল ফাঁড়িতে। বাঁকারামকে আমি কম চিনি? শালা একের নম্বরে ঢ্যামনা। ওর আগের বউটাকে দেখেছি। এটাকেও দেখলুম। বিয়ের মাগ বলে মনেই হয় না।

জগদীশ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সুন্দর-সুন্দর মেয়েগুলো মাইরি, সবখানে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত যত—(অশ্লীল শব্দ)—এর পাল্লায়

গিয়ে পড়ে। যাক গে। সিগারেট দাও। বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

উপেন্দ্র খাকি শার্টের বুকপকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেট বের করে বলল, সিগারেটও শেষ। এমন বেহদ্দ এরিয়া, একটা দোকান পর্যন্ত নেই। এই দেখ, মোটে একটা মাল। ছিঁড়ি?

না। তুমি বামুনের ছেলে। প্রসাদ দিও। বলে জগদীশ আড়া-মোড়া দিল। তারপর অকারণ কাঁচাপাকা গোঁফ পাকাতে থাকল। ছায়াঢাকা নদীতীরে ফুরফুরে হাওয়া এবং পাখির ডাকে প্রৌঢ় আইন-রক্ষকের মনে আরাম জেগেছে।

উপেন্দ্র হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল। দেশলাই কাঠিটা একটু তফাতে শুকনো পাতার ওপর ইচ্ছা করেই ফেলে দিল। সামনে নদীর পাড়ে ঘন ব্যানাবন। শুকিয়ে খড় হয়ে আছে। তাই উপেন্দ্র আগুনটা বাড়তে দিল না। বুটে ঘষে নেভাল। তারপর বলল, এবার জলতেষ্টা পেল।

জগদীশ হাসল। —কেমন থ্যাটটা দিয়ে এলে—মুর্গির ঝোলে কনুই ডুবিয়ে।

উপেন্দ্র চোঁ চোঁ করে সিগারেটে আরও দুটো টান মেরে জগদীশকে দিল। বলল, নদীও মাইরি শুকনো। জল পাই কোথায় বলো তো?

চৌকিদারের বাড়ি যাও ফের। জগদীশ চোখ বুজে ধুঁয়ো গিলতে গিলতে বলল।

উপেন্দ্র রাগ করে বলল, বাঁকার বাড়ি? ওই মাগীর হাতে জল খাব?

জগদীশ খিকখিক করে হেসে বলল, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে উপেন্দ্র।

তুমি—জগাদা মাইরি, যত বুড়ো হচ্ছ, তত—

সে হঠাৎ থেমে গেল। কানের ওপর থেকে কী ছলাৎ করে পড়ে কাঁধের খানিকটা শাদা করে ফেলেছে। দ্রুত কয়েক পা সরে সে রাগী দৃষ্টিতে মুখ তুলে গাছের দিকে তাকাল। ডালপালার আড়াল থেকে কোন পাখি কুকর্ম করেছে।

এবং তাকিয়েই সে লোকে দেখতে পেল। বেন্দা ফুট আষ্টেক উঁচুতে

দাবি করবে। কিন্তু জনপ্রাণীটি নেই। এপারটা গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়। তার মতলব ছিল, নিঃশব্দে একটা গ্রাম... যেখানে তারা কাল সন্ধ্যায় গা ঢাকা দেবে। এই আকস্মিকতা সে অনুমান করতে পারেনি। আইন-রক্ষকটিকে নিষ্পলক দৃষ্টে তার দিকে দেখামাত্র সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

জগদীশ বলল, এ হে হে! সর্বনাশ করেছে! ওবেলা বড়বাবু ফাঁড়িতে আসবেন ইন্সপেকশানে। উপেন্দ্র তার আগে ধুয়ে রেখো। বড়বাবু বড্ড খুঁতখুঁতে লোক কিন্তু। জুতোর ডগায় একচিলতে ময়লা থাকলে বাপ তুলে গাল দেয়।

উপেন্দ্র গর্জন করে বলল, তুই কোন শালা রে?

জগদীশ এবার টের পেল গাছের ওপর একটা কিছু ঘটেছে। সে মুখ তুলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, কী কাণ্ড! এ যে মাইরি দিনদুপুরে গেছোভূত। এই ব্যাটা! নেমে আয়!

বেন্দা কাঠ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কাল থেকে গ্রাম ছেড়ে মাঠঘাট বনবাদাড়ে ঘুরে, এবং খাওয়াদাওয়াও বিশেষ হয়নি, সে খুবই ক্লান্ত। নৈলে ধুপ করে পড়ে দৌড় দিত। সে ভীষণ দৌড়বান। তাছাড়া সে এখানকারই মানুষ। এ মাটির প্রতি ইঞ্চি তার মুখস্থ। বনজঙ্গল আর জলার দেশে লুকিয়ে পড়ার জায়গা অজস্র। অন্তত কোনোরকমে কাশবনের মধ্যে ঢুকতে পারলে তাকে আর খুঁজে বের করা আইনরক্ষকদের অসম্ভব হয়ে উঠত।

উপেন্দ্র বেটন তুলে বলল, নাম্ শালা এখুনি। নৈলে গিঁট খুলে দেব।

জগদীশ ক্রুর হেসে বলল, মনে হচ্ছে কোন পুরনো পাত্রী। এ্যাই! তোর নাম মুজফ্ফর?

এবার বেন্দা উঠে বসল। করুণ মুখে বলল, আজ্ঞে না সেপাইজী! আমি মুজফ্ফর নই, আমি বেন্দা।

আইনরক্ষকদ্বয় মুখ তাকাতাকি করল। তারপর উপেন্দ্র বেটন

জগদীশ বেটন ছুড়ে মারল। বেন্দা মুখ সরিয়ে নিল। বেটনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওপরের ডালে ঠোক্কর খেয়ে সশব্দে নিচে এসে পড়ল। উপেন্দ্রও তার বেটন ছুড়ল। বেন্দা সেটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর কাকুতিমিনতি করতে লাগল। —আমি বেন্দা, মা কালীর দিব্যি হুজুর! আমি বিলবাড়ির বেন্দা—বিশ্বাস করুন। আমি চোর নই—চোট্টা নই—আমি বেন্দা।

সে আতঙ্কে প্রলাপ বকতে থাকল। ভুলে গেল যে আইনরক্ষকের বেটন তার হাতে। উপেন্দ্র গাছতলায় ব্যস্তভাবে ঢিল খুঁজছিল। তার বেটন গিয়ে লাগল বেন্দার কোমরের হাড়ে। বাপরে বলে আর্তনাদ করে বেন্দা সে-বেটনটাও ধরে ফেলল। তারপর আঁকুপাঁকু করে ওপরের ডালে উঠতে থাকল। ভয়ে বেটনদুটো সে ফেলতে পারছিল না, পাছে আবার আইনরক্ষকরা তাকে ঢিট করে।

ওপরে মগডালে উঠতে উঠতে কতকগুলো ঢিল তার গায়ে লাগল। কিন্তু নদীর ধারের মাটিটা তত শক্ত নয়। জমানো দুধের মতো মাটির ঢিল তার গায়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছিল। জগদীশ ও উপেন্দ্র রাগে এবং অপমানে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। কিছুতেই গাছ থেকে নামানো যাচ্ছে না যখন, তখন স্বভাবত মাথায় আসা উচিত, ট্রেনিংয়ের সময় আসামী ধরার বিস্তর কলাকৌশল শেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু আসামী গাছে চড়লে তাকে নামানোর ফিকির কি শেখানো হয়েছিল—বিশেষ করে এমন অখদ্যে পাণ্ডববর্জিত স্থান দ্বারকা নদীর অববাহিকায়, যেখানে মাটির চাঙড় ছুড়ে মারা মানে শ্যালিকাদের তামাসা জামাইবাবুকে?

মগডালের ঘনপাতার আড়ালে বেন্দা গিরগিটির মতো লেপ্‌টে রয়েছে। এই গাছগুলো প্রায় তিরিশফুটপর্যন্ত উঁচু হয়। অসহায়, ক্লান্ত, লুব্ধ, অপমানিত এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ আইনরক্ষকদ্বয় এপাশে-ওপাশে মানুষ খুঁজছিল—যাকে বা যাদের ডেকে আইনসম্মত আবশ্যিক সাহায্য

দাবি করবে। কিন্তু জনপ্রাণীটি নেই। এপারটা গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা—তার ওধারে একটা গ্রাম, যেখানে তারা কাল সন্ধ্যায় রেঁাদে গিয়েছিল এবং এক দাগী আসামী পাকড়ানোরও হুকুম থাকায় তুপুর অব্দি ডিউটিকাল সম্প্রসারিত করার অজুহাত মিলেছে। এখন তাদের ফাঁড়িতে ফেরার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু গাছের ওপর নিশ্চয়ই এ ব্যাটা এক আসামী, অতএব একে পাকড়াও করে নিয়ে গেলে মুখরক্ষা হয়।

নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চল। তারপর ধু ধু মাঠ ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে দিগন্তের গ্রামে শেষ হয়েছে। বাঁদিকে—পশ্চিমে মাইলটাক দূরে নদী পেরিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। সাদা রঙের ব্রিজ গ্রীষ্মের রোদে ধু ধু জ্বলছে। দেখতেই ভয় করে সেই রোদকে। ঝলকে ঝলকে আগুনের হল্কা ছড়াচ্ছে দূরে। তরতর করে কাঁপছে কী ঝিলমিলে ঢেউ আদিগন্ত। লু হাওয়া বইছে হু-হু করে। কিন্তু এখানে নদীতীরে মাটি ও গাছপালার গুণে তাপের হলকাটা টের পাওয়া যায় না। বরং আরামে ঘুমই এসে যায় গাছতলায় বসে থাকলে।

কোথাও লোক নেই। জগদীশ ও উপেন্দ্রর রাগ কিছুক্ষণ পরে হাসিতে রূপান্তরিত হল। তুজনে হা-হা হো-হো করে হাসতে লাগল। অসংখ্য আসামী ধরার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। কিন্তু এমন বিদঘুটে অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। তুজনে হাত ঝেড়ে ধুলো সাফ করে হাসতে-হাসতে এবং হাঁফাতে-হাঁফাতে একত্র হল। জগদীশ বলল, শুয়রের বাচ্চা মানুষ, না ভূত মাইরি!

উপেন্দ্র বলল, শালার বাপ নামবে! ওয়েট।

তুজনে মুখ তুলে বেন্দাকে দেখতে লাগল। একহাতে বেটনতুটো ধরে রেখেছে, অন্যহাতে ডাল। তু'পা খাড়া আরেকটা ডালে বেড় দিয়ে রেখেছে। লোকটার গাছে চড়ার ক্ষমতা অসামান্য বলতে হয়। নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে এ অভ্যাস তার আছে। তার চেয়ে অদ্ভুত ঘটনা, গাছে চড়ে যে ঘুমোয়, সে কি মানুষ, না হনুমান?

জগদীশ বলল, শালা বাঁদর!

ধূর্ত উপেন্দ্র ডেকে বলল, এ্যাই ব্যাটা বেন্দা না ফেন্দা! লাঠিদুটো ফেলে দেদিকি লক্ষ্মীছেলের মতো। আমরা চলে যাচ্ছি। কই, ফেলে দে!

বেন্দা বলল, দিলে আবার মারবেন হুজুর!

জগদীশ বলল, না রে বাবা না! তোর সঙ্গে ফক্কুরি করলুম খানিক। কই, দে! চলে যাই!

বেন্দা কান্নাভরা গলায় বলল, আমি চো।র নই। চোরের ভাইও নই। খামোকা মারলেন!

উপেন্দ্র বলল, না-না বাবা। আর মারব না। দেদিকি লাঠি দুটো।

বেন্দার লাঠি দুটো ফেলে দেবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তখন জগদীশ বলল, উপেন্দ্র! সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। গাছে ওঠ। শালার কান ধরে নামাও। তারপর যা করার আমি করছি।

ট্রেনিংয়ে গাছে চড়া শেখানো হয়েছিল বৈকি। তাছাড়া উপেন্দ্র ছেলেবেলায় খেলাধুলো, সাঁতার, মারামারিতে যেমন—তেমনি গাছে চড়াতেও দক্ষ ছিল। তারপর কবে সেই ট্রেনিংয়ের সময় গাছে চড়েছে, তারপর এতকাল আর চড়ার দরকার হয়নি। বুটজুতো পরে গাছে চড়ার অসুবিধেও কম নয়। অগত্যা সে জুতো-মোজা খুলল। তারপর বেন্দার উদ্দেশে গর্জন করে বলল, থাম্ শালা পুন্নির ভাই। যাচ্ছি!

আইনরক্ষককে গাছে চড়তে দেখে বেন্দার মুখ শুকিয়ে গেল। এই প্রকাণ্ড গাছটায় চড়া সহজ কর্ম নয়। বসন্তে গাছটা খোলস ছেড়েছে। গুঁড়ি এবং ডাল খুব পিচ্ছিল। মসৃণ, দুধেআলতা রঙ। মাটি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচু পর্যন্ত কোনো ডাল নেই। চড়তে হলে একটু তফাতে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ডালটা আঁকড়ে কসরত দেখাতে হবে সার্কাসের খেলার মতো। আশার কথা, বোকা আইনরক্ষকটি গুঁড়িতে ওঠারই চেষ্টা করছে। অন্যজন তাকে ঠেলে ধরে আছে।

চেষ্টা করেও ওপরের ডাল আঁকড়ানো গেল না। তখন দুজনে ভারি অবাক হয়ে গেল। জগদীশ বলল, ব্যাটা চড়ল কী ভাবে? মইটই আছে নাকি ওপরে তোলা!

উপেন্দ্র বলল, কই মই? নেই তো!

জগদীশ বলল, হুঁ। তাহলে শালার মাগ মই এনে গাছে তুলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এ সেই মুজফর না হয়ে যায় না। উপেন্দ্র, গিয়ে বাঁকা চৌকিদারকে ডেকে আনো। আরও লোকজন আর একটা ভাল দেখে মই নিয়ে এস। আমি দেখি শালাকে।

উপেন্দ্র অনিচ্ছায় পা বাড়িয়ে বলল, কেলেংকারি! তারপর টের পেল, তার পায়ে জুতো নেই। তাই মোজা ও জুতো পরতে ব্যস্ত হল।

ঠিক তখনই মাথার ওপর খড় খড় ফট ফট শব্দ হতে থাকল এবং বেটন দুটো দুধারে ছিটকে এসে পড়ল। জগদীশ লাফ দিয়ে এগিয়ে আইনদণ্ড দুটি কুড়িয়ে আনল। খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি এতক্ষণে খুলেছে। থাম্ এক্ষুনি ব্যবস্থা হচ্ছে।

বেন্দা ওপর থেকে করুণ করে বলল, আমি চোর নই হুজুর। আমি বিলবাড়ীর বেন্দা। বাঁকাদাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কে।

উপেন্দ্র জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে অশ্লীল গাল দিয়ে বলল, তুই আমার—এর বাপ। তোকে এই গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে না পেঁদাই তো কী বলেছি।

জগদীশ আপসের সুরে বলল, দ্যাখ্ বাবা মুজফর! আর খামোকা ঝামেলা বাড়াস নে। আমি কথা দিচ্ছি, তোকে এ্যারেষ্ট করব না। শুধু মুখোমুখি দুটো কথা বলে ছেড়ে দেব। লক্ষ্মী বাবা আমার! নেমে এসো দিকি।

বেন্দা বলল, না হুজুর। আপনারা রেগে আছেন। খুব মারবেন। আজ দুদিন পেটপুরে কিছু খাইনি। মারলে আমি মরে যাব, বাবা গো!

সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জগদীশ ও উপেন্দ্র হেসে ফেলল। দাগী আসামীদের বিস্তর ছলাকলা তাদের পরিচিত। মুজফর নামে ফেরারী দাগী অবশ্য খুনে ডাকাত। খুনে ডাকাতদের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তারা কান্নাকাটি করে না, এমন নয়। রতনপুরের রহমত ছিল সেক্স ম্যানিয়াক। কমবয়সী মেয়েদের রেপ

করে মেরে ফেলত। জগদীশ তাকে পাঁচবারের বার ধরেছিল। রহমতের সে-কী কান্না!....মেয়েটা আমার পেটের মেয়ের মতো। হায় সেপাইজী! এ-কাজ আমি কোন মুখে করব? জগদীশ বলেছিল, ধুস্ শালা! তুই কী মাগী যে তোর পেট থেকে বিইয়েছিলি? বিচারে রহমতের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টে আপিল করে খালাস পায় বেকসুর! রহমত পরে খুন হয়ে যায় আততায়ীর হাতে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে দুষ্টের শাস্তি কোনো-না-কোনে.ভাবে হয়। জগদীশ মানে একথা।

উপেন্দ্র বলল, চললুম জগাইদা! শালা যেন পালায় না।

বেন্দা আর্তনাদ করে বলল, নামছি হুজুর। এখুনি নামছি! তারপর সে ডালবেয়ে তরতর করে নামতে থাকল।

জগদীশ ও উপেন্দ্র অবাক হয়ে তার নামা দেখতে থাকল। গুঁড়ির মাথায় এসে সে ছড়ানো সমান্তরাল ডালের ওপর দিকে যেই এগিয়েছে. দুই আইনরক্ষক চেঁচিয়ে উঠল, শালা পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!

বেন্দা কাতরস্বরে বলল, পালাইনি হুজুর। অতটা উঁচু থেকে এখন লাফ দিয়ে নামলে মরে যাব। দুদিন খাওয়া নেই কিনা। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি নামছি।

তবু দুজনে ডালটার তলায় ওকে অনুসরণ করল। ডালটা শেষ-দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে সেখানে কাশ এবং নাঠাকাঁটার ঝোপ। জগদীশ ও উপেন্দ্র বুঝতে পারল, এখান দিয়েই গাছে চড়েছিল ব্যাটা। কাঁটা বাঁচিয়ে পা দুটোকে বেন্দা ঝুলিয়ে দিতেই তাকে ওরা শূন্য থেকে ধরে নিল।

বেন্দাকে মাটিতে নামিয়ে দুজনে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। গাছের ওপর এই আসামীকে যতটা বয়স্ক দেখাচ্ছিল, ততটা নয়। বয়সে উপেন্দ্রর চেয়ে অনেক ছোট। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, খালি গা, কোমরে কোনোমতে পেঁচানো ময়লা একটা ধুতি। চেহারা থেকে সৌখিনতার ছাপ মুছে যায়নি এখনও। কোটরগত টানা-টানা চোখ। ভেজা গাল। সরু একচিলতে গোঁফও আছে।

গায়ের রঙ পোড় খাওয়া, তামাটে। জন্মের সময় হয়তো ফর্সাই ছিল কিছুটা।

দুই আইনরক্ষক একসঙ্গে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। অমনি বেন্দা করজোড়ে বলে উঠল, আমাকে মারবেন না হুজুর। মারলে আমি মরে যাব।

প্রথমে জগদীশ তার চুল খামচে ধরে পিঠে ফটাস করে বেটনের বাড়ি মারল। তারপর উপেন্দ্র তার পাঁজরে গুঁতিয়ে বলল, শালা পুঙ্গির ভাই!

বেন্দা বাপরে বলে পড়ে গেল শুকনো ঘাসের ওপর। জগদীশের হাতে কয়েকটা চুল রয়ে গেল। সে বেন্দাকে ফের চুল ধরে টানতে টানতে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে চলল। উপেন্দ্র থেমে নেই। হাঁটুর পাশে, কনুইয়ে, কখনও বাহু ও পিঠে ক্রমাগত বাড়ি মারছিল। বেন্দার আর্তনাদে জনহীন নিঃশব্দ নদীতীরের প্রকৃতি কাঁপতে লাগল। গাছের গোড়ায় নগ্ন মাটিতে তার চুল ছেড়ে দিল জগদীশ। তারপর হাঁটু দুমড়ে ধরাশায়ী বেন্দার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হেসে বলল, কী রে শালা মামদো? কেমন লাগছে এখন?

উপেন্দ্র তার জোড় করা হাতে বেটন মেরে বলল, খুব ভুগিয়েছে শালা! খুব ভুগিয়েছে তখন থেকে! নাও—নাও! এই নাও! এ্যাই! এ্যাই! এ্যাই!

বেন্দা শরবিদ্ধ জন্তুর মত গোঙাচ্ছিল। জগদীশ ইশারায় উপেন্দ্রকে থামতে বলল। তারপর ফের বেন্দার চুল টেনে বলল, নাম কী? এঁ্যা?

বেন্দা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আমি বিনোদ হুজুর। আমি বিলবাড়ীর বিনোদ।

তবে যে বেন্দা-বেন্দা করছিলি?

হুজুর, সবাই আমাকে বেন্দা বলে ডাকে।

উপেন্দ্র পাশে বসল। বলল, হ্যাঁ রে শালা! গাছে চড়েছিলি কেন?

বেন্দার দুহাতের আঙুল কেটে রক্তের ছোপ পড়েছে। চোখ মুছতে গালে রক্ত মেখে গেল। সে বলল, ঘুমোচ্ছিলুম হুজুর। কাল সারারাত শোয়ার জায়গা পাইনি। তাই বড্ড ঘুম পেয়েছিল।

জগদীশ হাসতে হাসতে বলল, এখনও চালাকি? গাছে ঘুমুতে উঠেছিলি?

অভ্যেস আজ্ঞে। ছোটবেলায় যখন বাবুদের বাড়ী রাখালী করতুম, এখানে গরুগুলো চরতে দিয়ে এই গাছটায় চড়ে ঘুমোতুম।

গাছে ঘুম হয় মানুষের? জগদীশ বেটন তুলল।

বেন্দা ব্যস্ত হয়ে বলল, হয় হুজুর। আমার হয়।

উপেন্দ্র বলল, তোর বাড়ী নেই যে গাছে ঘুমোতে এসেছিলি?

সে দুঃখের কথা কী বলব হুজুর! বেন্দা হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল: ছোটবেলা থেকে আমার বাবা-মাকে দেখিনি। মাসির হাতে মানুষ। মাসির ওপর রাগ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

জগদীশ ধূর্ত ভংগিতে হাসল।...রাগ করে! পালিয়ে বেড়াচ্ছিস! এ শালা মহা ধড়িবাজ দেখছি!

বিশ্বাস করুন! মাসির ওপর আমার ঘেন্না হয়েছে খুব। বেন্দা ফের হাত জোড় করেছে। কিন্তু এবার আর বেটন পড়ল না। সে ধরা গলায় বলতে থাকল। মাসি আমার সামনে থেকে কাল দুপুরে ভাতের থালা কেড়ে নিলে। কতরকম খোঁটা দিলে। আমি ধোয়া-হাত মুছতে মুছতে পালিয়ে এলুম।

উপেন্দ্র বলল, রাতে কোথায় ছিলি?

বেন্দা আস্তে আস্তে উঠে বসল। আঙুল তুলে নদীর ওপারে কোণাকুণি একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, প্রথমে ওখানে গেলুম হুজুর ওই যে কুঁড়ে ঘরখানা দেখছেন—যুধিষ্ঠিরের কুঁড়ে। লোকটা ওখানে চাষবাস করে। দুমুঠো খেতে অবশ্যি দিলে। কিন্তু থাকতে দিলে না। বললে, এখানে জায়গা হবে না বাপু।

জগদীশ বলল। তুই চোর বলে দিলে না!

না হুজুর। ওর কুঁড়েটা খুব ছোট। দুজনের জায়গা হয় না। আর···

বেন্দা ওই অবস্থাতেই একটু লাজুক হাসল। জগদীশ বলল, আর কী রে শালা ?

শালা শুনে বেন্দা বুঝল, ওর কথা এরা বিশ্বাস করছে না। তবু মরীয়া হয়ে বলল, আর হুজুর—গাঁয়ের লোকে জানে—চৌকিদারদাকে জিগ্যেস করবেন, যুধিষ্ঠিরের কাছে কে শুতে যায়।

খিকখিক করে দুই আইনরক্ষক হাসতে থাকল। তারপর জগদীশ বলল, হুঁ। কে শুতে যায় ?

আজ্ঞে, হরিমতী।

সে কে ?

ওই যে বাবুর বাগানে থাকে। হরিমতী বোষ্টুমী। সেজন্যেই তো বাবু যুধিষ্ঠিরের একখানা জমি কেড়ে নিয়েছে।

উপেন্দ্র বলল, এ পুঙ্গির পুত মহাভারত খুলে বসল দেখছি। এ্যাই! বল, কেন এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস ?

সত্যি বলছি হুজুর। মাকালীর দিব্যি। মাসির ওপর রাগ করে।

আবার বেটনের গুঁতো খেয়ে সে থেমে গেল। জগদীশ বলল, উঁহু! দেখেই বুঝেছিলুম এ এক অতল জলের মাছ। ওঠ শালা! ফাঁড়িতে চল্। তারপর আসল কথা কীভাবে বেরিয়ে আসে, দেখা যাবে। ওঠ্।

উপেন্দ্র তার বাহু ধরে ফের গুঁতো মেরে টেনে ওঠাল। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, উরে ব্বাস! দুটো বেজে গেছে। চলো জগাইদা! চৌকিদারকে পেলে ভাল হত। কিন্তু আর গাঁয়ে যাওয়ার সময় নেই।

জগদীশ বেন্দারই ধুতির এক অংশে বেন্দাকে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর চুল ধরে টেনে বলল, চল্ শালা!

বেন্দা আকাশ ফাটা আর্তনাদ করে উঠল। মিথ্যেমিথ্যি আমাকে মারধোর করছেন হুজুর! আমি চোর নই। আপনাদের পায়ে পড়ছি, আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন না।

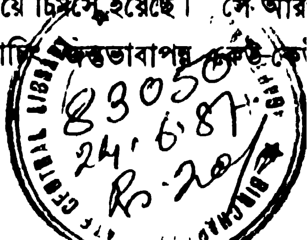
উপেন্দ্র তার পেছনে বেটনের গুঁতো ও বাড়ি মারতে থাকল। নির্জন নদীতীরে একটা উপদ্রব বটে। এখানে ছায়া আছে। পাখিরা আছে। শান্তি আছে। বিশ্রামের আরাম আছে। সব তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো ভারি সন্দেহজনক। একজন এমন চোর-চোট্টা চেহারার লোক গাছে চড়ে ঘুমোচ্ছিল। তাছাড়া আইন-রক্ষকদের কথায় গাছ থেকে সে নেমে আসেনি। উপরন্তু বেটনদুটো আটকে রেখেছিল। অপরাধের সংখ্যা কম নয়।

তার ওপর অসংলগ্ন কথাবার্তা। অথচ পাগল নয়। আগে জগদীশ, মধ্যে বন্দী বেন্দা এবং পেছনে উপেন্দ্র। মাঝে মাঝে সে বেটন চালাচ্ছে এবং আসামী এত বিদঘুটে চেঁচাচ্ছে যে মেজাজ আরও চড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ছায়া ঢাকা নিচু বাঁধের পথ ধরে এই সংক্ষিপ্ত মিছিল এগিয়ে চলল দূরের ব্রিজের দিকে।...

বাবু এবং হরিমতী

পরনে নীল লুঙি, গায়ে হাফহাতা সাদা পানজাবি, আঙুলে সিগারেট এবং মুখে পান—কমলাক্ষ রাস্তা থেকে চড়াগলায় ডাকছিলেন, বোষ্টুমী, আছিস নাকি? ও বোষ্টুমী!

হরিমতী দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে মুসুরের কুটো বাছছিল। তার বয়স অনুমান করা কঠিন। একসময় হালকা ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটি রূপে ফেটে না পড়লেও অনেকের নজর কাড়িতে পারত। তখন ওর জীবনের সুদিন ছিল। অর্থাৎ খাওয়াদাওয়াটা নিশ্চিন্তে জুটত। তখন ওকে প্রেম দিতে আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাও ছিল। খাওয়াদাওয়া জুটলে শরীরটা চেকনাই থাকে। খাওয়া-দাওয়ার টানাটানিতে শরীর শুকিয়ে চিমসে হয়েছে। সে আরও পাঁচটা গ্রাম্য মেয়ের মতো মেয়ে। কদাচিৎ কেউ ভাবাপন্ন কেউ কেউ তার দিকে লোভী চোখে তাকায়।



কমলাক্ষের ডাক শুনে হরিমতী চমকে উঠেছিল। ক'দিন থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, যায় নি। এবার বুঝি কুরুক্ষেত্র বাধাতে নিজেই হজির। কাঠা পাঁচেক জায়গা ঘিরে ইটের নিচু পাঁচিল ভেঙেচুরে আছে। যেখানে দরজা, সেখানে তালপাতার আগড় বাঁশের বাতায় আঁটোশাঁটো। আগড় ঠেলে কমলাক্ষ ঢুকলে দেখা গেল পায়ে জুতো নেই। হরিমতী মুখ নিচু করে পা দুটো দেখছিল।

একেবারে গাঁয়ের শেষে নদীর উঁচু পাড়ে ফুলফলের বাগানের কেন্দ্রে মাটির ঘর। একসময় ফুল ফল বেচে হরিমতীর বা তার মরে যাওয়া স্বামীর অন্ন জুটত, যে ছিল এই বাবুর বাগানের মালী। এখন ফুলফলের গাছ ছন্নছাড়া। চোরচোট্টা, লম্পট এবং দুষ্টু ছেলেপুলেদের দৌরাত্ম্যে বাগান বিধ্বস্ত। আর হরিমতীও তত খাটিয়ে মেয়ে নয়। জলসেচ, নিড়েন, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি যেসব পরিচর্যা দরকার, তাতে বরাবর তার আলস্য ছিল। যখন সে বাড়ি থাকত না, ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে গরু ছাগল ঢুকে মুড়িয়ে খেত। তাছাড়া তার ওপর রাগ করে রাতবিরেতে কারা গোড়ায় কোপ মেরে বা উপড়ে অসংখ্য ফুল গাছ মেরে ফেলেছে।

গোবিন্দমালী ছিল ওড়িষ্যার লোক। হরিমতীর বাপের বাড়ি এই গ্রামেই। গোবিন্দের আমল গেলেও হরিমতী বাবুপরিবারের কৃপা পেয়েছিল। তার বিবিধ কারণ থাকতে পারে। এমনকি বিধবা হরিমতী কিংকর বোরেগীকে নিয়ে বাস করছিল, তাতেও বাধা আসেনি। বোরেগী খোল বাজিয়ে লম্ফঝম্ফ করে খুব কেত্তন গাইত। মাঝে মাঝে মাধুকরী করতেও বেরুত। শেষদিকে পান আর বিস্কুট বেচে বেড়াত। বানের জলে ডুবে বোরেগী মারা পড়েছিল। তারপর হরিমতীর অন্নকষ্ট সমানে চলেছে। শুধু বোষ্টুমী পদবীটা টিঁকে আছে। যা একান্তই কিংকরের স্মৃতিদৃষ্ট। কখনও হরিমতী বোষ্টুমী শুনলে বেজায় চটে যায়। কখনও মিষ্টি হেসে মেনে নেয়।

কমলাক্ষ উঠোনে দাঁড়িয়ে পানখাওয়া মুখে হাসলে হরিমতীর যেন

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আস্তে বলল, এবেলা যাব-যাব ভাবছিলুম গো, বুঝলেন? এবেলাই যেতুম।

কমলাক্ষ বললেন, গিয়ে আমাকে উদ্ধার করতিস। তোর নিজের ভালর জন্যেই ডেকেছিলুম। ও কী ঘাঁটছিস?

হরিমতী সলজ্জ হাসল। মুসুরী গো! ধানুর বউয়ের কোলেরটা দুধতুলুনীতে ভুগছিল। মায়ের কাছে একটা গাছ পেয়েছিলুম। মনে ছিল গাছটা। মধু দিয়ে বেঁটে চটকে আঙুল চোষালে দুধতোলা সারে।

সারল বুঝি?

হুঁউ। হরিমতী কুলো রেখে উঠল। চালের বাতা থেকে চাটাই পেড়ে বলল, বসুন বাবু। দুখিনীর ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন যখন, বসুন দু'দণ্ড।

কমলাক্ষ বসলেন না। বললেন, মুসুরী ভাঙবি কোথা রে? চাকি আছে ঘরে?

হরিমতী মাথা নাড়ল। সেদ্ধ করে খাব এবেলা। চাকি কী হবে?

বলিস্ কী! মুসুরীসেদ্ধ খাবি কেন?

হরিমতী হাত বাড়িয়ে বলল, পয়সা দিন না তবে। চাল কিনে ভাত খাই।

সে হাসছিল। কমলাক্ষ মুখে দুঃখ ফুটিয়ে বললেন, তোর অন্নকষ্ট ইচ্ছাকৃত। তুই যে বড্ড কুঁড়ে মেয়ে। এই এতখানি জায়গা, কত সব ফুলফলের গাছ ছিল—কী করেছিস সব। এ্যা?

কমলাক্ষ ঘুরে-ঘুরে চারদিকে গাছপালা দেখতে থাকলেন। কোনার জামগাছে সবুজ জাম ধরেছে থোকা-থোকা। বৃষ্টির ছিটে পেলেই রঙ বদলে বেগুনী হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেই বা কী? বারোভূতে লুঠে খাবে। দুটো আমগাছও আছে—একটা কলম গাছ। আমের চিহ্ন নেই। লিচু গাছও ছিল একটা। ঝড়ে ভেঙে যায়। কালো গুঁড়ি ঘিরে কাশ গজিয়েছে। আতা, পেয়ারা, ডালিম—কত গাছ ছিল। একটাও নেই। ফুলের গাছের মধ্যে শুধু একটা কাঠমল্লিকা টিঁকে আছে। আগাপাছতলা ফুল এবং মিঠে গন্ধ। জবা, টগর

কামিনী কত ফুল ফুটত। কিছু নেই। শুধু আগাছার মধ্যে ধুঁকছে একটা কল্কেফুলের ঝাড়। ওটা বন্য।

হরিমতী খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, নতুন করে কী দেখছেন বাবু? কবে শত্তুরের পাল শেষ করে দিয়েছে গাছপালা। নালিশ নিয়েছে কেউ কখনও? পায়ে তো মাথা ভাঙতে বাকি রাখিনি কারুর।

হুঁ! কমলাক্ষ তার দিকে ঘুরলেন। তোকে ডেকেছিলুম, মধুপুরে গিয়ে মোতাই মিয়ার ছেলে পান্নাকে একটা দরখাস্ত দিয়ে আয়। আমি পান্নাকে বলে দিয়েছি। ও লিখে দেবে। তুই টিপছাপ দিবি।

হরিমতী আঁচল কামড়ে বলল, কিসের দরখাস্ত বাবু?

কমলাক্ষ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, বাস্তুভিটে দিচ্ছে সরকার থেকে। যার যেমন ফ্যামিলি, তাকে তেমন। তোকে কাঠাটাক দেবে। পীরের থান আর ঢেলাইচণ্ডীর মাঝখানে পাঁচ একর বাঁজা ডাঙা আছে দেখেছিস?

হরিমতী মাথা দোলাল।

জায়গাটা ভালই। বানবন্যায় ডোবার যো নেই। এমনি উঁচু জায়গা...কমলাক্ষের সিগারেট নিভে গিয়েছিল। ফুঁক ফুঁক করে টেনে ফেলে দিলেন। ফের বললেন, কখন যাচ্ছিস পান্নার কাছে?

হরিমতী আস্তে বলল, কেন?

কী কেন?

একটু কেসে গলা সাফ করে হরিমতী বলল, জায়গা দিচ্ছে তা আমিও শুনেছি। কানিকুড়ো, দুলাল, তারপরে যোগীকাকা—সবাই নাকি বাউন্তজায়গা পেয়েছে। তা আমাকে দেবে কেন বাবু? হরিমতী শুকনো হাসল এবার। আমার তো এই পাঁচকাটা বাউন্তজায়গা আছে। যার জায়গা আছে, তাকে তো দেবার নিয়ম নেই।

কমলাক্ষ চোখ বড় করে শুনছিলেন। খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন, তুই এখনও গোবিন্দের কথা ধরে বসে আছিস বোষ্টুমী! নেহাত মেয়েছেলে তুই—মাথার ওপর কেউ নেই। তাই এ্যাদ্দিন কিছু বলিনি।

ভেবেছিলুম, উঠে যেতে যে বলব, যাবি কোথা? যদ্দিন বেঁচে আছিস, থাক। তারপর আমার জায়গা আমারই হবে।

হরিমতী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার কাছে রেকোডপরচর কাগজ আছে বাবু। সেটেলমেণ্টোতে আমার নাম রেকোড হয়েছে। বছর-বছর আর খাজনা নিচ্ছে না—আমিও চুপ করে বসে আছি।

কমলাক্ষ আরও জোরে হেসে ওর কথা উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা—এসব উদ্ভুটে বেঅ'ইনী কথাবার্তা কে তোর মাথায় ঢোকাল বল্‌তো বোষ্টুমী? যুধোশালা?

হরিমতী নিজের পা দেখতে দেখতে বলল, তা কেন? আমি তত বেবুক মেয়ে নই বাবু সে আপনি যাই বলেন। আমার ঘরে সব কাগজপত্তর আছে।

কমলাক্ষ হাত বাড়িয়ে বললেন, কই দেখা কী কাগজপত্তর আছে। বের কর।

হরিমতী শক্ত হয়ে বলল, দেখাব। দশজনকে ডাকুন। অঞ্চল-পেধানকেও ডাকুন।

কমলাক্ষ জানেন এসব কথা তাঁকে শুনতে হবে। এর আগেও কথা তুললে হরিমতী এসব কথাই অন্যভাবে বলেছে—একটা স্পষ্ট করে অবশ্য বলেনি। ধূর্ত কমলাক্ষ দাওয়ার চাটাইতে ধূপ করে গিয়ে বসে পড়লেন। ফের সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কী রে? টানবি নাকি? নে—বুদ্ধির ঘরে ধুঁয়ো দে আগে। তারপর কথা হচ্ছে।

হরিমতীর সিগারেট টানতে প্রচণ্ড লোভ হচ্ছিল। অতিকষ্টে সামলে নিল। বলল, ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছ? চালাকি? কমলাক্ষ একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন। যুধোশালার মাচায় বসে বিড়ি ফুঁকতে দেখিনি বুঝি? নে—এখন না খেতে ইচ্ছে করে। রেখে দে। পরে খাস।

হরিমতী তবু হাত পাতছে না দেখে কমলাক্ষ জোর করে তার হাতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে প্রেমিকের গলায় বললেন, বোষ্টুমী! তোর সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলা থেকে ভাব। তুই বড্ড নিদয়া মেয়ে রে!

নৈলে কিছু ভুলতিস না। যাক্ গে, সে-সব দুঃখ মনে চাপা আছে, চাপাই থাক।

হরিমতী সিগারেটটা আলতোভাবে ধরে রইল। তার শরীর কাঁপছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল।

কমলাক্ষ চাপা গলায় ফের বললেন, মধুপুরে স্কুলের বোর্ডিং থেকে রাতদুপুরে পালিয়ে আসতুম তোর কাছে। মনে পড়ে? সেবার প্রচণ্ড বান। তুই তোর বুড়োকে নিয়ে ঘরের চালে উঠে বসে ছিলি। রিলিফের নৌকো না আনলে কী হত বল্? তোদেরও নৌকোয় তুললুম, এ ঘরটাও জলে বসে গেল। চালটা ভাসতে ভাসতে চলে গেল। ইস! কী সাংঘাতিক দৃশ্য!

হরিমতী মুসুরীভরা কুলোটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর আর বেরুনোর নাম নেই।

কমলাক্ষ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বানবন্যা আবার আসবে বোষ্টুমী। তারপর উঠলেন। মুখ থমথম করছে। আধপোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উঠোনের নগ্ন মাটিতে। নীল ধোঁয়া উড়তে থাকল।

তখন হরিমতী ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, বসুন। রাগ করবেন না। আমি সামান্য মেয়েমানুষ!

তক্ষুনি কমলাক্ষের থমথমে ভাবটা চলে গেল মুখ থেকে। ভুরু তুলে বললেন, কে মেয়েমানুষ? তুই? তুই পুরুষমানুষের কান কাটতে পারিস বাবা! ওকথা বলিস নে!

কমলাক্ষ ফের বসলে হরিমতীও একটু তফাতে বসল। বলল, ভিটেমাটির জন্যে দরখাস্ত করতে বলছেন। কতকাল ধরে সাধলুম, বিধবাদের মাস-মাস টাকা দিচ্ছে গরমেণ্টোর ঘরে—একটুকুন বলে দিন মিয়ার ছেলেকে। দিলেন? আপনি পঞ্চাতের মেম্বার! একটা কথা বললেই হয়ে যেত।

কমলাক্ষ জিভ চুকচুক করে বললেন, একদম খেয়াল হয়নি রে। বলেছিলি বটে। ঠিক আছে। হবে।

হরিমতী হাসল। হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়। বলল, অন্নদির 'পেনসেন' হল। কেন? না—সে আপনার বাড়ির ঝি। তাও তো অন্নদির ঘরে অমন যোয়ান বোনপো। খেটেখুটে মাসিকে খাওয়াতে পারে।

কার কথা বলছিস? বেন্দার? কমলাক্ষ ফ্যাঁচ করে হাসলেন। বেন্দা অন্নকে খাওয়াবে? বেন্দা কী করেছে জানিস?

হরিমতী মাথা নাড়ল শুধু।

বেন্দা কোন গাঁয়ে কার বাড়ি চুরিচামারি করেছিল। ফাঁড়ির পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পেঁদিয়েছে। কমলাক্ষের চ্যাপ্টা শরীর এবং ভুঁড়ি দুলতে থাকল হাসির চোটে। একটু আগে দেখে এলুম, লেংচে বেড়াচ্ছে।

হরিমতী আস্তে বলল, শুনেছি।

উঠোনে ধোঁয়ানো সিগারেটটা হাওয়ার ধাক্কায় গড়িয়ে গেছে। নীল ধোঁয়াটা মরে এসেছে। কাল সন্ধ্যায় মধুপুর বাজারে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিলেন কমলাক্ষ। পুরনো সাঁতলাধরা মাল। পাড়াগাঁয়ের দিকে এইসব মাল পাঠায় শহরের ডিলাররা। কমলাক্ষ টুকরোটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে আজ অত মনমরা দেখাচ্ছে কেন বোষ্টুমী? রাতারাতি বড্ড বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল যেন।

হরিমতী ফের হাসল। আমি বুড়ি না তো কী?

কমলাক্ষ রসিকতা করবেন ভাবলেন। অনেকদিন পরে এভাবে নিরিবিলি এসে এবং বসে গল্প করছেন হরিমতীর সঙ্গে। মনে একটা টানাপোড়েন চলেছে। একদিকে বৈষয়িক স্বার্থ—সেটা ভারি জোরালোও বটে, অন্যদিকে পীরিতিজনিত পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি, যা নস্টালজিয়া, এবং কিঞ্চিৎ লোভও। গ্রামের টেরে নির্জন এই বাড়ি এবং হরিমতীর মতো মেয়ে। মানুষের স্বভাব আসলে কুকুরের।

কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্বাস ফেলে বললেন, আমিও বুড়ো হয়ে গেলুম শালা!

হরিমতী আঁচ করল, বাবুর মন নরম হয়েছে। সুযোগ বুঝে বলল,

পুরনো কথাই এখন তুললেন, তখন একটা বলি। এ জায়গা-টুকুর ওপর আর চোখ দেবেন না বাবু। আপনার জায়গা-জমির তো অভাব নেই। তাছাড়া এ জায়গা আপনার বাবাঠাকুর আমাদের দান করে গেছেন। বিশ-বাইশ বছর এ জায়গা আমরা ভোগদখল করছি। স্বত্ব বসে গেছে। আইনে তো আর আপনি পান না বাবু! বলুন? আপনি তো লেখা-পড়া জানা লোক!

পীরিতের স্মৃতিজনিত নস্টালজিয়ার কুয়াশা মুছে গেল মন থেকে। কমলাক্ষ চোখ কটমট করে বললেন, আইন দেখাচ্ছিস বোষ্টুমী? খুব আইনজ্ঞ হয়েছিস, বটে? তুই জানিস, ইচ্ছে করলে তোকে কবে এখান থেকে বের করে দিয়ে দখল করতে পারতুম? এখনও পারি, জানিস তুই?

কান্না চেপে হরিমতী বলল, পারলে বের করে দিয়ে দখল নিন।

ওরে! ওঠে দাঁড়ালের কমলাক্ষ। যুধোশালা তোকে বাঁচাবে ভাবছিস? ঠিক আছে।

বলে চ্যাপ্টা পা দুটো থপথপিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হরিমতী কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো। সত্যি যদি দখল নিতে আসেন, ঠেকাতে পারবে কি হরিমতী? সে ঘামতে থাকল। গলা শুকিয়ে গেল। যুধো বলেছিল, জায়গাটা বেচে দিয়ে মধুপুরে চলে যেও বোষ্টুমী। তিনশো না দেয়, কমপক্ষে দুশো টাকা তো দেবে কাঠাপিছু। অনেক টাকা পাবে। তাই দিয়ে বরং পান সিগারেটের দোকান খুলবে।

রোদ বাড়ছে। দুপুর হয়ে এল। সকালে দুমুঠো মুড়ি চিবিয়েছিল। ক্ষিদেয় নাড়ি হু হু করে জ্বলছে। দাওয়ার কোনে উনুন জ্বেলে শুকনো পাতা গুঁজে দিতে দিতে মুসুরি সেদ্ধ করতে থাকল হরিমতী। পুরনো সুদিনের কথা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল। সে গুণগুণ করে সুর ধরে প্রথমে গোবিন্দের জন্য, পরে কিংকর বোরেগীর জন্য কাঁদতে লাগল।...

কলকাতার মেয়েটা

কলকাতা থেকে গ্রামের—যে কোন গ্রামের দূরত্ব বড্ড বেশি। কিন্তু গ্রাম—যেকোনো গ্রাম থেকে কলকাতার দূরত্ব খুবই কম। দ্বারকা নদীর তীরে এই গ্রাম বিলবাড়ির অসংখ্য লোক কলকাতা যাতায়াত করে কাজে বা অকাজে। কিন্তু কলকাতার কজনই বা এ গ্রামে আসে?

পূর্বা নামে মেয়েটা এসেছে। কারণ বাইশ বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল এ গ্রামে। তার বাবা মনমোহন কমলাক্ষের জ্ঞাতি-ভাই। কলকাতায় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করতেন। প্রতি শনিবার বাড়ি আসতেন দুপুর রাতে। ফিরে যেতেন ভোররাতের বাসে। মাইলটাক দূরেই হাইওয়ে। কিন্তু বয়স বাড়লে আর ধকল সইছিল না। ফ্যামিলি নিয়ে চলে যান কলকাতায়—তখন পূর্বার বয়স আট বছর।

এ পর্যন্ত বার তিনেক সপরিবারে এসেছেন মনমোহন। কমলাক্ষের বাড়িতেই দু-তিনটে দিন কাটিয়ে গেছেন। নিজের বাড়িটা কমলাক্ষকে বেচে দিয়েছিলেন। এখন সে বাড়ি ধূলিসাৎ করে কমলাক্ষ সবজিক্ষেত করেছেন। বাকি যেটুকু সম্পত্তি ছিল—একটা পুকুরের তিন আনা অংশ, একটা আমবাগানের চার আনা, একটা বাঁশবনের দুআনা এবং বিঘে তিনেক ধানক্ষেত—ক্রমেক্রমে বেচে দিয়ে গেছেন কমলাক্ষকেই। শরিক হিসেবে কমলাক্ষের দাবি ছিল অগ্রগণ্য।

পূর্বারা তিনবোন একভাই। বোনেদের মধ্যে পূর্বা ছোট। তার দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা তমালেরও হয়েছে। তমাল থাকে দিল্লিতে। ডিফেন্সে কমিশনড র‍্যাংকে চাকরি করে। পূর্বা তার দিদিদের চেয়ে বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রী হিসেবে ততকিছু মাথা না থাকায় টেনেটুনে গ্রাজুয়েট হতে পেরেছে। তাতেই মনমোহনের বেজায় গর্ব। কমলাক্ষের পাঁচটা মেয়েই স্কুল

পেরুতে পারেনি। চারটেকে নানা জায়গায় গছিয়েছেন। ছোট মঞ্জুর বয়স বছর ষোল হয়েছে। পাত্র খোঁজা হচ্ছে। মঞ্জু দারুণ সুন্দরী। একটু জংলী স্বভাবেরও বটে—এ জঙ্গুলে গাঁয়ে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার বাবা কমলাক্ষ তুর্বলচেতা মানুষ—যদিও বৈষয়িক বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্টই আছে। কিন্তু তার মা কমলারাণী খুব দজ্জাল মেয়ে। মঞ্জু তার মায়ের স্বভাব অনেকটা পেয়েছে।

পূর্বা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। তবে সে সবসময় সেজে গুজে ঝকঝকে হয়ে থাকে। মঞ্জুর পাশে তার চেহারা অনুজ্জ্বল দেখাবার কথা—কিন্তু সে কলকাতার মেয়ে। নাগরিক ছটা আছে তার চলনে-বলনে। তাই হঠাৎ তাকালে মঞ্জুর চেয়ে পূর্বাকেই সুন্দরী ভ্রম হয়। তাছাড়া গ্রামের খর রোদ, তীব্র বাতাস মঞ্জুর জন্মগত দেহবর্ণকে ক্ষয়ে ফেলে। কলকাতায় থাকলে হিড়িক ফেলতে পারত।

পূর্বা ও মঞ্জু বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল। গ্রামে মেয়েদের এভাবে বেড়নোর রীতি নেই। কিন্তু পূর্বা এখন কলকাতার মেয়ে। বেড়ানো ব্যাপারটা তার অভ্যাসে এসেছে। বিকেলে বাড়ির ভেতর বসে থাকার মানে হয় না। তাছাড়া এই গ্রামটারও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে। মঞ্জু মায়ের ভয়ে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু পূর্বা কাকিমার অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল। কমলা বলেছেন, বেলা ডোবার আগেই বাড়ি ফিরবে। আজকাল সময় খারাপ। আর শোনো, নদীর ধারে যাচ্ছ তো? কখনো বাঁশবনের ভেতর দিয়ে যাবে না বা আসবে না। বাগদীপাড়া ঘুরে যেও। বরং নোলে-টোলে কাউকে সঙ্গে নিও ফেরার সময়।

মঞ্জু কিন্তু বাঁশবনের ভেতর দিয়েই পূর্বাকে নিয়ে এল। বাঁশবনটা তিন একর বিস্তৃত। মাঝখান দিয়ে গ্রাম থেকে নদীর তীরে আসার একফালি পথ আছে। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। এরই মধ্যে পোকা-মাকড়ের রাতের ডাক শুরু হয়েছে। কিন্তু ওপরে রোদের এলাকায় পাখাপাখালি দিনের বেলার গান গাইছে গলা ছেড়ে। তবু সব ভীষণ স্তব্ধ লাগছিল পূর্বার কাছে। পূর্বা আগেও এসে টের পেয়েছে গাছ-পালার জগতটা যেন উদ্দেশ্যহীন আর নিরর্থক। মাঝামাঝি পৌঁছেই

তার গা ছমছম করছিল। ছোটবেলার কথা যতটুকু মনে পড়ে, তাতে গ্রামের ভূতপ্রেতের ব্যাপারটাই বেশি। এই বাঁশবন সম্পর্কে তার কোনো বিশেষ স্মৃতি নেই। তবে ভৌতিক অনুষঙ্গটা আছে বড় জোর। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘন ছায়ার ভেতর শুকনো বাঁশপাতায় নখের আঁচড় কেটে ছাতারে পাখির একটা ঝাঁক হল্লা করছিল। তারপর আবছা একটা খট্ খট্ শব্দ শোনা গেলে দুজনে থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু কান পেতে শুনে বলল, কেউ চুরি করে বাঁশ কাটছে!

পূর্বা অবাক হয়ে গেল। ...চুরি করে বাঁশ কাটছে? কী হবে বাঁশ?

মঞ্জু চাপা গলায় বলল, বেচে আসবে বাজারে। বাঁশের খুব দাম যে!

পূর্বা বলল, এই বাঁশবনটা তোমাদের না?

হুঁ। মঞ্জু এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, পূর্বাদি, তুমি একটু দাঁড়াবে? আমি দেখে আসি কে বাঁশ কাটছে।

পূর্বা ভয় পাওয়া গলায় বলল, না না। বরং চলো, ফিরে গিয়ে বাড়িতে বলবে।

মঞ্জু চোখ নাচিয়ে বলল, ততক্ষণে চোর কেটে পড়বে। তুমি দাঁড়াও না বাবা একটুখানি। আমি চোরটাকে দেখে আসি।

মঞ্জু শুকনো বাঁশ পাতার ওপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। তখন পূর্বাও তার সঙ্গ নিল। দুজনেই শুকনো মুখে হাসছিল। পূর্বা ফিসফিস করে বলল, এই! যাওয়াটা আমাদের ঠিক হচ্ছে না। আজকাল চোরেরা নাকি বড্ড ফেরোশাস? ওদের কাছে রিভলবার ড্যাগার, বোমা এইসব থাকে।

মঞ্জু বলল, একি তোমাদের কলকাতার চোর? পাড়াগাঁয়ের ছিঁচকে চোর। দেখবে, আমাদের টের পেলেই লেজ তুলে পালাবে।

কঞ্চির খোঁচা লাগার ভয়ে মঞ্জু দুহাতে কঞ্চি সরিয়ে পা মাড়াল। ফিসফিস করে পূর্বাকে সতর্ক করতে ভুলল না। খট্ খট্ শব্দটা মাঝেমাঝে

থেমে যাচ্ছে, আবার শোনা যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর পূর্বা বলল, থাক্ গে। ফিরে এস মঞ্জু। আমার বড্ড ভয় করছে।

মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল, তোমায় তো বললুম ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো। শুনলে না।

এইসময় শব্দটা ফের থেমে গেল। তারপর অন্যরকম শব্দ হতে থাকল—সড় সড়্ সড় সড়্! শব্দটা একটানা। পূর্বা বলল, ও কিসের শব্দ মঞ্জু?

মঞ্জু বলল, বাঁশটা ঝাড় থেকে টেনে বের করছে। এই! দেখে পা ফেলবে! এখানে অনেক গর্ত আছে।

পূর্বা বলল, সাপটাপ নেই তো?

চুপ্। নাম করতে নেই। মঞ্জু হঠাৎ দাঁড়াল।

কী?

দেখতে পাচ্ছ চোরকে? ওই দেখ।

পূর্বা এতক্ষণে বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ছায়ার ভেতর আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেল। চোর এবার কাটা বাঁশের কঞ্চিগুলো ছাঁটছে। অন্যদিকে চোখ নেই তার! পূর্বা বলল, চিনতে পারছ চোরটাকে?

মঞ্জু গুম হয়ে গেছে। বলল, হুঁউ। বেন্দাশালা।

পূর্ব হতভম্ব হয়ে গেল ওর মুখে শালা শুনে। বলল, ও কী মঞ্জু! ও কী বলছ?

বলব না তো ছেড়ে দেব। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।—বলে মঞ্জু কোমরে আঁচল জড়াল। তারপর পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলল। সেটা হাতে নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

পূর্বা জুতো খুলল না। আতঙ্ক, বিরক্তি ও হতাশাজনিত মোহভঙ্গে তার অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু একমুহূর্তও একা হয়েপড়া তার পক্ষে সম্ভব নয় এখন। সে অগত্যা মঞ্জুকে অনুসরণ করল। আগাছার কাঁটায় কাপড় টেনে ধরছিল। গর্তে পড়ে হোঁচটও খাচ্ছিল। যখন সে একটা শুকনো বাঁশের কঞ্চিতে আটকে গেছে, তখন ওদিকে মঞ্জু নিঃশব্দে চোরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেন্দা আপনমনে বসে বাঁশের কঞ্চি ছেঁটে ফেলছে। এই দুর্গম জায়গায় কেউ এসে পড়তে পারে, তার ধারণায় আসে না। বাঁ হাঁটুর কাছে আইনের মারের ব্যাথা এখনও ঘোচেনি। তাই বাঁ পা ভাঁজ করতে পারছে না—ছড়িয়ে রেখেছে সামনে। তারপর হঠাৎ পেছনে 'এই শালা চোর' শুনে ভীষণ চমকে ঘূরল সে এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মঞ্জুর নাকের ফুটো ওঠা-নামা করছে। সে হাঁফাচ্ছে। ফের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, এই বেন্দাশালা!

অন্য সময় হলে বেন্দা খেঁকশেয়ালের মতো গুলতির বেগে পিঠটান দিত। কিন্তু পায়ের যা অবস্থা, দৌড়ুনোর ক্ষমতা নেই। বুকেপিঠেও আবছা ব্যথা আছে। হাত দুটোর অবস্থাও করুণ! দুহাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে দা ধরতে পেরেছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আর কিছু না পেরে ফ্যাঁস্ করে বেলুনফাটার মতো হাসল। —মঞ্জুদিদি, ধরে ফেললে তাহলে?

মঞ্জু বলল দাঁত বের করতে লজ্জা করে না? চুরি করে বাঁশ কাটছিস যে!

বেন্দা দা রেখে ন্যাকড়াবাঁধা হাতদুটো মঞ্জুর পায়ের দিকে বাড়িয়ে বলল, পায়ে ধরি দিদি! এবারকার মতো ছেড়ে দাও। বাবাকে যেন বলো না। এই নাককান মলছি মঞ্জুদিদি, আর কক্ষণো বাঁশ কাটব না।

মঞ্জু একপা পিছিয়ে বলল, এত মার খেয়ে তোর লজ্জা নেই রে শালা।

বেন্দার মাসি অন্নপূর্ণা মঞ্জুদের বাড়ির ঝি। বেন্দা একসময় মঞ্জুদের গরুও চরাত। কাজেই মঞ্জুর 'শালার' সঙ্গে সে পরিচিত। বাবুর মেয়ের জন্যে সে কতবার কত শালুক-পদ্ম তুলেছে মারাত্মক গভীর জল থেকে। কতবার বিল থেকে পাণিফল এনে দিয়েছে। এই বাবুর মেয়ের পাখি পোষার সাধ মেটাতে অসংখ্য গাছে সে চড়েছে। বাঁশবন থেকে আলদা বাঁশ কেটে নিয়ে খাঁচা বানাতে। সেদিনও মঞ্জু এমনি

করে পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশের কঞ্চি ছাঁটা দেখেছে। আজকাল বেন্দার জীবনে সব ওলটপালট অবস্থা। দরমা থেকে হাঁস-মুর্গির ডিম, এবং এমন কী, একবার খিড়কির পুকুর থেকে জ্যোৎস্নারাতে জাল ফেলে মাছ চুরি করতে গিয়েই বাবুর বাড়ি তার পর হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জালটাও ছিল চুরিকরা। মোহনবাগদীর জালটা আমড়াগাছে রাতের বেলা শুকোচ্ছিল। মোহন তাকে খুব স্নেহযত্ন করত বাবা-মা হারা ছেলে বলে। মোহন তাকে কোলে বসিয়ে এই গ্রীষ্মে তাড়ি খাওয়াত। মোহনই তাকে গাঁজার ছিলিমের জুড়িদার পর্যন্ত করেছিল। সেই মোহনও আজ সাতবছর আর রা কাড়ে না বেন্দাকে।

বেন্দা দুঃখিত মুখে বলল, আমার সব দুঃখের কথা যদি শোনো মঞ্জুদিদি, আমার ওপর রাগ করতে পারবে না। দিদি, তোমার মনটা খুব ভাল। আমি তো জানি। এই তুচ্ছু একটা বাঁশ—

মঞ্জু একপাটি জুতো তুলে মাথায় মারতে গিয়ে মারল না। বলল, তা চুরি করবি কেন রে বাঁদর? চুরি করবি কেন? চেয়ে নিতে কী হয় তোর?

কাকে চাইব? বেন্দা হাসল। বেশ তো, তোমাকেই চাইছি। এই বাঁশটা নিয়ে যেতে দাও। দেবে?

আগে চাইলে দিতুম। —বলে মঞ্জুর পূর্বার কথা মনে পড়ল। পূর্বা তখনও কঞ্চি থেকে শাড়ি ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ছায়ার মধ্যে তার মুখটা অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে মঞ্জু খিলখিল করে হেসে ফেলল। মঞ্জু অনেকবার কলকাতা গেছে মনোকাকার বাড়িতে। কলকাতার ভিড়ে গণ্ডগোলে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। কলকাতার মেয়েদের তার বড্ড ন্যাকা মনে হয়েছে। কিন্তু পূর্বাদির এই ন্যাকামির কোনো মানে হয়? একটা শুকনো আমোড়া বাঁশের কঞ্চি থেকে বেরুতে কেলেংকারি করে ফেলল। মঞ্জু দৌড়ে গিয়ে ঝোঁকের বশে আস্ত বাঁশটা তুলে হ্যাঁচকা টানে ছুড়ে ফেলল। তার ফলে পূর্বার আঁচলটা করকর করে ছিঁড়ে গেল। পূর্বা রাগে গুম হয়ে গেল। মঞ্জু হাসতে

হাসতে তার হাত ধরে এই ফাঁকায় টেনে আনার পর সে হাত ছাড়িয়ে নিল।

বেন্দা ঘুরে ব্যাপ্যরটা দেখছিল। ফিক করে হেসে বলল, কলকাতার দিদি যে। তারপর ন্যাকড়াজড়ানো হাত যোড় করে কপালে ঠেকাল। ফের বলল, এসেছেন তা শুনেছি দিদি। ভেবেছিলুম, ছুটো টাকা চাইব দিদিকে। কিন্তু বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরেও মুখখানা দেখতে পেলুম না।

মঞ্জু বলল, ও পূর্বাদি। তাহলে বুঝতে পারছ, গতরাতে তোমার জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে ছিল?

বেন্দা বলল, আবার কে? এ বেন্দা হতভাগা। ও কলকাতাব দিদি, দাও না ছুটো টাকা।

মঞ্জু বলল, চোপ্ শালা। অবশ্য হাসতে হাসতেই বলল।

পূর্বা রাগ করে বলল, মঞ্জু। বাড়ি যাই এস। শাড়িটা বদলাতে হবে।

মঞ্জু বেন্দার দিকে চোখ কটমট করে বলল, বাড়ি যাব কী? এই চোরটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না?

তাহলে আমি যাচ্ছি। বলে পূর্বা পা বাড়াল। কিন্তু প্রাণ গেলেও সে বাঁশবনে আর ঢুকছে না। সামনের দিকটা বেশ ফাঁকা। বাঁশবনের সীমান্তে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে! সেদিকে বিকেলের সোনালী রোদের পর্দা টাঙানো। পূর্বা কয়েক পা এগিয়ে গেল হনহন করে। তারপর থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু ও বেন্দা তার চলে যাওয়া দেখছিল। ছুজনেই মিটিমিটি হাসছিল। তারপর পূর্বাকে দাঁড়াতে দেখে বেন্দা বলল, কী গো কলকাতার দিদি? সাপ-টাপ নাকি!

পূর্বা সত্যি একটা সাপ দেখতে পেয়েছে। সবুজ রঙের একটা সাপ বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে জড়িয়ে একটা ঝোপে বারবার মুখ ঠেকাচ্ছে এবং তুলে নিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। জিভটা লকলক করছে। পূর্বা এত ভয় পেয়েছে যে নড়তেও পারছে না। সাপটা একটু তফাতেই

আছে। কিন্তু সরু ফাঁকা জায়গাটার মাথায় থেকে সে বেরুবার রাস্তা আটকেছে।

বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটা কঞ্চি-হাতে কাছে গেল। সাপটাকে খোঁচাখুঁচি করে তাড়িয়ে দিল। তারপর একগাল হেসে বলল, তুটো টাকা হল কলকাতার দিদি।

মঞ্জুর সাপের ভয় নেই, তা নয়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তো সাপ থাকবেই। একটু দেখে শুনে চলাফেরা করলেই হল। কাছে এসে সবুজরঙে সাপটাকে দেখে সে বলল, লাউডগা। না রে বেন্দা ?

বেন্দা রে ঝোপে সাপটা ঢুকছে, সেই ঝোপটার মাথায় কঞ্চির বাড়ি মারতে মারতে বলল, যাঃ। যা চচলে যা আপন ঠেঁয়ে। আর কখনো কলকাতার দিদিমণিকে ভয় দেখাবিনে।

সাপটা ঝোপের ভেতর নিখোঁজ হয়ে গেল। পূর্বার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চারপাশের সব সবুজে সে সবুজ সাপ কিলবিল করে বেড়াতে দেখছে। মঞ্জু তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ও পূর্বাদি। কী হল ? যাও এবারে।

পূর্বা এবার হেসে ফেলল। হাসিতে রাগদুঃখ তুই-ই আছে। বলল, যাঃ। কোনো মানে হয় না।

মঞ্জু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই। তোমার মুখের রঙ চটকে গেছে।

পূর্বা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, বেশ হয়েছে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার টিপটা ঠিক করে দিই। রুমাল দাও। বলে মঞ্জু পূর্বার কোমরে আটকানো ছোট্ট রুমালটা টেনে নিল। পূর্বা বাধা দিল। কিন্তু মঞ্জু ছাড়বে না। তার মাথার পাশে একটি হাত রেখে ধ্যাবড়ানো লাল টিপের চারদিক ঘষতে থাকল। বেন্দা অষ্টাবক্রের মতো দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

পূর্বার একটু-আধটু মেক-আপের অভ্যাস বরাবর। কপালে মোটা করে একটা টিপ, ঠোঁটে রঙ এবং গলায় হাঁসুলিছাঁদের মালা পরে

বেরোয়। শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলানো টিপ বা লিপস্টিক। গ্রামে এসে এই সাজের জেল্লা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দেয়। মঞ্জুর মায়ের চোখে এটা ভীষণ দৃষ্টিকটু। আইবুড়ো মেয়ে কপালে টিপ পরবে কী। তার ওপর ঠোঁটে ওইরকল নিলাজ রঙ। শহরের বেশ্যারাই তো এমন করে সাজে। কিন্তু পূর্বা গ্রাহ্য করেনি কাকিমাকে—কোনবারই পাত্তা দেয়নি। আর কমলাক্ষ বলেছেন, আজকাল টাউনের মেয়েদের এই রীতি। বনবাদাড়ে পড়ে আছ। তাই দেখতে পাও না।

কমলা মনেমনে অপছন্দ করেন ভাসুরঝিকে। মঞ্জুকে ভেতর-ভেতর কতটা নষ্ট করে দেয় কে জানে। শেষে ভাবেন, দু-তিনটে দিন বই তো নয়। তবে মঞ্জুও অন্য স্বভাবের মেয়ে। সাজগোজে তার একটুও মন নেই। যদি ওইরকম করে সাজত মঞ্জু, তার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারত পূর্বা।

কিন্তু এই এক স্বভাব মানুষের। গ্রাম থেকে যে কলকাতা চলে গেছে, সে যখন গ্রামে আসে অবরে-সবরে, পুরুষ হোক কিংবা মেয়ে —সাজগোজের চটকে ও জেল্লায় গ্রামে পড়ে থাকা লোকেদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়। কমলাক্ষ সমঝে দিয়েছিলেন স্ত্রীকে। —দেখেছ তো? মণিদার মতো সাদাসিদে মানুষও কীরকম বিয়ের বর সেজে বিলবাড়ি আসেন। আধময়লা ধুতি আর হাফসার্ট পরে ফি-শনিবারে আসতেন। আজকাল এলে দেখে মনে হয় মধুপুরের সেকালের জমিদারকুলের কেউ। তবে কথা কী, আজকাল শহুরে লোকের রোজগারও বেড়েছে। কিন্তু কমলার মতে ভড়ং দেখাতে আসে। কলকাতায় দেখানো যায় না বুঝি, তাই এই বিলবাড়িতে।

মঞ্জু টিপ করে দিতে-দিতে ফিসফিস করে বলল, পূর্বাদি। আজ রাত্তিরে আমায় সাজিয়ে দেবে?

পূর্বা বলল, দেব। এখন ছাড়ো! চলো, ফাঁকায় বেরিয়ে যাই।

বেন্দা মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, খুব সুন্দর হয়েছে দিদি টিপখানা! আচ্ছা দিদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মঞ্জু বাঁকা চোখে তাকাল। পূর্বা বলল, কী জিজ্ঞেস করবে?

আচ্ছা দিদি, মুখে কি তুগ্‌গোপিতিমার মতো 'তেলঘাম' মেখেছেন? নাকি পালিকা?

মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল। পূর্বা অনুমান করল 'তেলঘাম' বলতে কী বোঝায়। সেও হাসতে লাগল। এই সুযোগে বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে কষ্ট করে বাঁশটা কাঁধে তুলল। মঞ্জু তাকিয়ে দেখল চোর তার কাজ শেষ করে পালাচ্ছে। সে গম্ভীর মুখে বলল, বেন্দা এই শেষবার কিন্তু।

বেন্দা দাঁত বের করে বলল, আবার? কক্ষণো না। তাই বলে অন্য কেউ বাঁশ চুরি করলে যেন বেন্দার ঘাড়ে ফেলোনা মঞ্জুদিদি। হ্যাঁ, হাতে-নাতে এমন করে ধরলে পরে না কথা। জুতো তো রইল। মেরো।

সে তুজনের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতরে বাঁশটা নিয়ে চলল। বোঝা যাচ্ছিল, তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পূর্বা বলল, কোথায় নিয়ে যাবে বাঁশটা?

বেন্দা বলল, মধুপুরের বাজারে ননীদাকে বেচব। চায়ের দোকানের বেঞ্চি বানাবে। ও মঞ্জুদিদি, একটু সঙ্গে সঙ্গে এসো না দয়া করে। নৈলে লোকে ভাববে চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছি।

আসলে মঞ্জু চাইছিল, বেন্দা ও তার কাঁধের বাঁশ ঝোপঝাড়ের ভেতরকার গোপন আপদগুলোকে হটিয়ে দেবে। সবুজ সাপটা দেখার পর তারও অস্বস্তি হচ্ছিল। পাশাপাশি তুজনে বেন্দার বাঁশের ডগার পেছনে পেছনে হেঁটে ফাঁকা চষাজমিতে গেল। তারপর মঞ্জু উত্যক্ত করতে শুরু করল বেন্দাকে। সে হঠাৎ-হঠাৎ বাঁশের ডগার দিকটা তুলে এবং এদিক ওদিকে নাড়া দিয়ে বেকায়দায় ফেলছিল ওকে। বেন্দা কাকুতি মিনতি করছিল। বাবুর মেয়ে বরাবর এমনি তুষ্টু এবং ফাজিল।

বেন্দা কাতরস্বরে বলছিল, দোহাই দিদি, নড়িও না। ফাঁড়ির শালারা হাড়গোড় ভেঙ্গে রেখেছে।

পূর্বা বাধা দিলে মঞ্জু শান্ত হল। প্রকাণ্ড ভাঁড়ুলে গাছের কাছে এসে বলল, ওই দেখ দিদি। ওই ডালে ঘুমুচ্ছিলুম। খামোকা আমাকে পাবড়া মেরে নামিয়ে বেধড়ক পেটালে। তারপর ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার পাল্টা করে ঠেঙালে। পেরাণটা শক্ত বলে যায় নি দিদি।

পূর্বা বলল, কোথায় চুরি করেছিলে?

চুরি? বেন্দা চোখ বড় করে বলে। আমি কি চোর? না দিদি, খামোকা। মোটা সেপাইজী ডাণ্ডা মারে আর বলে, কেন গাছে চড়ে ঘুমুচ্ছিলি? রোগা সেপাইজী গুঁতো মারে ধমকায়, কেন শালা······

হঠাৎ কথা বন্ধ করে বেন্দা বাঁশ নিয়ে সড়াৎ করে নদীর গর্ভে চলে গেল। বাঁশের ডগাটা একটু হলেই পূর্বার পেটের নিচে গুঁতো মারত। সে ছিটকে সরে এসেছিল। তারপর নদীর খাড়াপাড়ের নিচে বেন্দা বাঁশসহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মঞ্জু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই লোকটাকে দেখে পালিয়ে গেল বেন্দা। দেখতে পাচ্ছ? ওই যে।

পূর্বা দেখল, কোনাকুনি নদীর ওপারে ঢালু পাড়ে দাগড়া দাগড়া সবুজের মধ্যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের চাষাভূষো মানুষ যেমন দেখতে হয়, তেমনি। হাঁটুঅব্দি মালকোচা করে পরা কাপড় —খালি গা। কিন্তু লোকটার মাথায় সাধুসন্ন্যাসীর মতো চুলের ঝুঁটি। পূর্বা বলল, কে ও?

মঞ্জু বলল, যুধিষ্টির পূর্বাদি। তরমুজ খাবে?

পূর্বা মাথা নাড়ল। কিন্তু মঞ্জু তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল এবং পা বাড়াল। পূর্বা অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল। ছেঁড়া আচলটাই তার এখন অস্বস্তির কারণ। ঢালু ঘাসজমির ওপর দিয়ে নদীতে নামতে-নামতে পূর্বা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল।

নদীখাত সোনালী বালিতে ভরা। শুধু শেষপ্রান্তে তিরতির করে একফালি জল বয়ে যাচ্ছে। একটু তফাতে খানিকটা দহ রয়েছে। দহের মাথায় চকচক করছে একফালি ঘাটের রাস্তা। ওপরে পাড়ে

একটা বাঁকটেরা হিজলগাছ। তার ওপাশে যুধিষ্ঠিরের ছোট্ট কুঁড়েঘর।

মঞ্জু বলল, যুধোকাকার সঙ্গে বাবার মামলা হচ্ছে জমিজমা নয়ে।

তাহলে ওর কাছে যাচ্ছ যে? পূর্বা অবাক হয়ে বলল।

মামলা হচ্ছে বাবার সঙ্গে। তাতে আমার কী? বলে মঞ্জু জুতো খুলে পূর্বার হাত ধরে জলে নামল। পূর্বাও জুতো খুলে নামল। বিকেলের রঙ ফিকে হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। নদীর বুকে ছায়া ও আলো মেশামেশি হয়ে আছে। ওপরে উঠতে অসুবিধে হল না—এ পাড়টা বেশ ঢালু। নদীর কাঁধের এইসব জমিকে বলে 'কাঁটা জমি'। চৈতালী ফলিয়েছিল চাষীরা কোথাও-কোথাও। এখন ধু ধু করছে। কোথাও কুমড়ো, তরমুজ, লংকার ঝাড়। বেগুনক্ষেতও। যুধিষ্ঠির দেখছিল ওদের। কাছাকাছি গেলে হামলা। এই। আমি ভাবছি দিনদুপুরে ই কী উপদ্রু রে বাবা!

মঞ্জু বলল, উপদ্রু মানে? ও যুধোকাকা, উপদ্রু আবার কী?

যুধিষ্ঠির বলল, ওই হল আর কী। তা হ্যাঁ গো মঞ্জুমা, এটিকে তো চিনলুম না?

ন্যাকামি করো না। কলকাতার জেঠামশায়ের মেয়ে।

যুধিষ্ঠির উঁচু মানুষ। মুখ নামিয়ে পূর্বাকে দেখে বলল, ইনি বড় না ছোট, না মধ্যমকন্যা বড়বাবুর।

মঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, ইনি ছোট।

অ। তা দেখে থাকব। যুধিষ্ঠির পা বাড়িয়ে বলল। এস মাজননীরা। ওপরে পোস্কের জায়গায় এস। তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল, মঞ্জু হাঁটু দুমড়ে বসে একটা প্রকাণ্ড তরমুজ টানাটানি করছে। বোঁটা ছেঁড়া সহজ নয়। তাই বলল, উরে ব্বাস। রাখো, রাখো। তোমরা ওপরে গিয়ে বসো। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ওপরে হিজলতায় পরিষ্কার নিকানো মাটি। ছোট্ট খড়ের কুঁড়েঘর। একটুকরো ঝকঝকে দাওয়া। দাওয়ায় তালাই পেতে বসে কেউ তাড়ি খাচ্ছিল। মাটির ছোট্ট হাঁড়ির মুখে ন্যাকড়াবাধা—অর্থাৎ ছাঁকনা।

দুটো খালি এঁটো গেলাস দুধের মতো সর লেগে আছে ভেতরে।
মঞ্জু মুখ টিপে হেসে দাওয়ায় উঠল। তারপর ভেতরে উঁকি মেরে বলল, হুঁ হুঁ। ধরে ফেলেছি বেরিয়ে এস বলছি—নইলে ভীষণ চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দেব।

হরিমতী খি খি করে বেজায় হাসছিল। মাতাল হয়ে গেছে খানিকটা। আলুথালু চুল, এলোমেলো কাপড় এবং কাদামাটির চেহারা। দাওয়ায় বেরিয়েই জিভ কেটে বলল, ও মা। ওটা বটাঠাকুরের কলকাতার মেয়েটা না? ছি, ছি, কী লজ্জার কথা মঞ্জু, তুমি কাজটা বাপু ভাল করলে না।

মঞ্জু ধমকাল....থামো। লজ্জা, না হাতি। ও পূর্বাদি, বোষ্টুমী-কাকী কেমন ভোল বদলেছে দেখছ? চিনতে পারছ না? আমাদের বাগানে থাকে—সেই যে মালী বউ। তুমিইতো কত গল্প করছিলে।

পূর্বা হরিমতীকে চেনে। বলল, বোষ্টুমীকাকী, কেমন করে ওসব খাও, একবার দেখাও না।

হরিমতী তক্ষুণি পা ছড়িয়ে বসে গেলাসে তাড়ি ঢালল এবং ঢকঢক করে গিলে বলল, দেখলে তো? তারপর জড়ানো গলায় গান গাইতে লাগল এ হরিমতী অন্য হরিমতী।

বেন্দার নতুন আশ্রয়

হাইওয়ের গতি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। তার পশ্চিম পিঠে যধুপুর, পূবে ন্যাড়া মাঠ ধু ধু। সবে ঢাউস চাঁদ উঠেছে এবং আলোআঁধারে জটপাকানো জ্যোৎস্না ঝিম মেরে বসে আছে মাঠের দিকে। রাস্তার ধারে জুগজুগ করছে বিদ্যুতের পিদীম। ধোঁয়ায়-ধুলোয় ম্রিয়মান ননীর চায়ের দোকানে পাঁউরুটি কামড়ে চোয়ালে ব্যথা ধরে গেছে বেন্দার। দুগেলাস চায়ে ভিজিয়েও এ জিনিস নরম হবার নয়। চোয়ালে ঘুষি মেরেছিলেন প্রথম দর্শনেই ফাঁড়ির এ এস আই লক্ষ্মীবাবু,

যাকে সবাই জমাদারবাবু বলে ডাকে। বেন্দার শক্ত খাদ্য চিবিয়ে খেতে দেরি হবে।

ননী ঠকাবেই জানা কথা। চোরাই মাল তা কি জানে না সে? একখানা পুষ্টু বিশ-পঁচিশ ফুট বাঁশের দর দশটাকা। বেন্দাকে আড়াই টাকা দিয়ে ননী ব্ল্যাকমেল করেছে। তবু কতদিন পরে টাকা ছুঁল বেন্দা। মরা ধড়ে প্রাণ এল। খালি হ্যা হ্যা করে হাসে। কিন্তু চোয়ালে ব্যথা বলে ঠোঁটদুটো শুওরের মতো গোল হয়ে যায়। যাক। প্রাণভরে হাসতে পেরেছে তো।

কান্তর কাছে একখিলি পান খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গাঁয়ে ফিরছিল। আজকের আনন্দ ভয়হীন, নিখাদ। বাবুর মেয়ের কাছে বলেই নিয়েছে বাঁশখানা—ননী তা না মানুক, সে নিজে তো জানে—ও চুরি নয়। ধম্মের বাঁশ। সুতরাং ব্রিজ পেরিয়ে মুখ উঁচু করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেন্দা চেরা গলায় চ্যাচামেচি করে গান ধরল। তারপর বাঁয়ে ঘুরে পুবমুখো হয়ে নদীর ধারে বাঁধের পথে নামল। সামনে চাঁদের ততক্ষণে ফুলো ভাবটা কমেছে। আকারে ছোট হয়েছে। আজ রাতে কী মোলায়েম হাওয়া শূন্য নদীর ওপর বয়ে যাচ্ছে। গানের ঘোরে বেন্দার হঠাৎ মনে হল, তার একটা বউ থাকলে খুব ভাল হত। বছর দশেক আগে বেন্দা তখনও রাখাল—যদু ছুতোরের ছাগলচরানী মেয়েটাকে নিরিবিলি পেয়ে প্রেমভিক্ষে করে ফেলেছিল। ছুঁড়ি তাকে দেখলেই ফিকফিক করে হাসত। অথচ এই সামান্যতেই যদুর কানে তুলে দিলে যদু ঘিসকাপ হাতে বেন্দাকে মাঠে-মাঠে তাড়া করে বেড়িয়েছিল। শালা ভাগ্যটাই এমন বেজম্মা। এমন তো নয়। গাঁ-গেরামে কেউ পীরিত করে না। বেন্দার ভারি অবাক লাগে, কী গুণ থাকলে মেয়েদের মন পাওয়া যায়?

অন্নমাসি বলেছিল, যদি সুপুত্তুর হয়ে থাকতিস আর রোজগার পাত্তি করতিস সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিতুম। তা সে তিনকুড়ি টাকা লাগুক আর পাঁচকুড়ি। আমি দিতুম। কিন্তু জানি, তোর রীতি

উল্টো। তুই চোট্টামি শিখেছিস। সবাই তোকে চোর বলে জানে। তোকে মেয়ে কে দেবে রে বাটপাড় ?

মাসি তার মার খাওয়ার পর একটু নরম হয়েছে বটে, খেতেও দিচ্ছে চাইলে পরে—কিন্তু ভুলেও বলছেনা, বেন্দা রে! এবারে যা হবার হয়েছে। মুনিশ খেটে খা। সুহালে থাক্। বিয়ের কনে দেখি।

টাকার আনন্দ ক্রমে মরে গেল বেন্দার. মাসি তার বিয়ে দেবে না। তাহলে কেমন করে সে বিয়ে করবে? এ বয়সে একটা মেয়েমানুষ না থাকলে যে বেন্দার মতো পুরুষ মানুষের রাত পোহানো ভার। মন এত খারাপ হয়ে গেল যে বেন্দা ঝোঁকের মুখে নদীর খাতে নেমে গেল। বালির চরায় ধুপ করে বসে ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকল। রাগ করেই ভাবতে থাকল। ধুস শালা এমনি করে বাঁচতে আছে মানুষের? পাখ-পাখালিও এই খরার মাঝে জোট বেঁধে ঘুরছে। বৃষ্টি পড়লেই ডিম পাড়বে বাসায়। ছানা বেরুবে। কে না জোট বাঁধবে। কেনা জোট বাঁধে? সাপ আর সাপিনীও জোট বেঁধে আজকাল ফোঁসফোঁস করে আনন্দে। এখন জোট বাঁধার ঋতু। অথচ বেন্দার জোটবাঁধার যো নেই। সে মানুষ। মানুষের জোড় বাঁধতে পয়সা লাগে। অনেক পয়সা। অত পয়সা যোগাড় করতে হলে তাকে মুজফরের মতো ডাকাত হতে হয়। কিন্তু মুজফর হওয়া কি সহজ কথা?

সামনে নদী একটু বেঁকে গেছে। খাড়া একটা লম্বাটে অন্ধকার দেয়ালের নিচে খানিকটা জ্যোৎস্না মেয়েমানুষের মতো আদরে শুয়ে আছে। শুয়ে থাকতে-থাকতে জ্যোৎস্নাটা নড়তে লাগল। নড়তে নড়তে উঠে দাঁড়াল। তখন মেয়েমানুষের মতো জ্যোৎস্নাটাকে কালো দেখাল. বেন্দা কুতকুতে চোখে দেখতে দেখতে ভাবল, ব্যাপারটা কী হল? ভূতপ্রেতের ওপর বিশ্বাস থাকলেও ভয় তার নেই। সে রাত চরা ছেলে বরাবর। এখন তো সওয়া কুড়ি বছরের ডাগর যোয়ান। ওই যে আবছা কালো কী একটা আসছে, ওটা ভূত হোক

আর যাই হোক, বেন্দা না দেখে ছাড়বে না। সে উঠে দাঁড়াল।

একটু পরে টের পেল, ওটা মানুষ। এবং মেয়েমানুষ!

বেন্দার বুকটা ধড়াস করে উঠল। কে এমন মেয়েমানুষ নিশি-রাতে নদীর চড়ায় অমন করে আসছে? কারুর বউ পালাচ্ছে নাকি? বেন্দা কখনও স্বচক্ষে দেখেনি, শুনেছে—কেমন করে রাতবিরেতে বউ পালিয়ে বাপের বাড়ি যায়। তখন দুষ্ট মানুষের পাল্লায় পড়লেও ভয়ে লজ্জায় চুপ করে থাকে।

তাহলে কি কোনো দেবদেবী উড়ে যাচ্ছিল আকাশপথে এবং যেতে যেতে বেন্দার মনের সাধ টের পেয়ে এই ব্যবস্থা করে গেল? দুরুদুরু বুকে বেন্দা পা বাড়াল। বাঁ ঠ্যাঙের যন্ত্রণাটা ভুলে গেল একেবারে। শেয়াল যেমন করে ছাগলের দিকে চুপিচুপি এগিয়ে যায়, তেমনি করে এগোল। শেষ কয়েকপা ছুটে গিয়ে লাফ দেবে। যা আছে বরাতে।

বেন্দা মনে মনে সেই দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সাধছিল, কখনও জীবনে মেয়ে সঙ্গ করিনি বাবারা, মায়েরা। অন্তত এই একবার দয়া করো। নাককান মুলে বলছি, আর চাইব না। মাত্র একবার।

মেয়েমানুষটা টলতে টলতে একবার এদিকে একবার ওদিকে যাচ্ছে। ডাইনে খাড়া পাড়। কোথাও ঝোপ ঝুঁকে এসেছে। সেদিকে গিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। আবার বালির চড়ায় পা বাড়াচ্ছে। তার মধ্যে বারকতক আছাড়ও খেল।

শেষবার আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেন্দা গিয়ে তাকে ধরল। তারপর বুকের ভেতর কোন পড়ার শব্দে ঘ্যাঁচ করে বলে উঠল, অ্যাই বোষ্টুমীমাসি। ই কী গো।

হরিমতী চেঁচাতে গিয়ে খিক খিক করে হাসতে লাগল। বেন্দা নাকি রে? আমার কপাল বাপ, আমার ভাগ্যি।

বালি থেকে উঠে গা ঝাড়ছিল বেন্দা। হাসছিলও। ইটা কী হল বোষ্টুমীমাসি? এ্যা? যুধোকাকার ঠেঁঞে খুব তাড়ি মেরেছো। মেরে এই অবস্থা। এ্যাঁ?

হরিমতী তখনও পা ছড়িয়ে বসে আছে বালির চড়ায়। হাসিটা

ক্রমে মরে এল। তারপর ফোঁস করে কেঁদে ফেলল।

বেন্দা জানে, নেশার নিয়ম এই। হাসবে, আবার তক্ষুনি কাঁদবেও। বোষ্টুমী অবশ্যি খুব সহজে মাতাল হয় না। বেন্দা দেখেছে অনেকবার। কুনাইপাড়া থেকে বেন্দা গত খরার মাসে তালগাছে উঠে তাড়ি চুরি করে এনেছিল। বাবুর বাগানের ওদিকেই কুনাইপাড়া। তাই হরিমতীর চোখে পড়ে যায়। হরিমতীর ঘরে বসে তাড়িটা খাওয়া হয়েছিল—হরিমতীর ভাষায়, 'মায়ে-পোয়ে শাবাড় করি আয়।'

বেন্দা জেনেশুনেও বলল, তা কাঁদবার কী আছে বোষ্টুমীমাসি? বিরিজ অব্দি গেলে ওপরে ওঠার রাস্তা পেতে—সে তোমার যতই নেশা হোক। কাঁদা-কাঁদি রেখে এখন ওঠ।

হরিমতী তবু কাঁদে।...তোকে ঠাকুর মিলিয়ে না দিলে আমার কী হত রে বেন্দা?

বেন্দা রেগে গেল।...অত গেলো কেন এ বয়সে—সামলাতে না পারবে যদি? একথাতেও তার রাগ পড়ল না। ফের মুখে ভেংচি কেটে বলল, যুধোর ঘরে জায়গা হল না, না? তোমার বলিহারি যাই বাপু। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছ, এখনও রঙ গেল না। শালা।

থুথুও ফেলল যে। এখন কড়া নীতিবাগীশের মতো ধর্মাধর্ম ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের জ্ঞানে বেন্দার মাথা টগবগ করে ফুটছে।

হরিমতী তার পায়ের কাছে শুকনো বালিতে থাপ্পড় মারল। ...বেন্দা! মা-মাসির সঙ্গের ঠাওর করে কইবি।

বেন্দা দমল না। বলল, তুমি মা-মাসি? ওরে আমার কে রে। আমার মা-মাসি হলে এতক্ষণ বালিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতাম না? রাগ বাড়িও না বোষ্টুমীমাসি।

হরিমতী এবার ডুকরে উঠল, অ্যাই বাপ বেন্দা, আমি রাতকানা রে।

সঙ্গে সঙ্গে বেন্দা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটু চুপ করে থাকার পর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, অ। এতক্ষণে সে

বুঝতে পেরেছে, কেন হরিমতী অতদূর থেকে এদিক-ওদিক করতে-করতে আসছে। সে দুঃখিত মনে ফের বলল, এতক্ষণ বললেই পারতে বোষ্টুমীমাসি। তাই রোগ তো তোমার ছিল বলে শুনি নি। কবে বাধালে ?

হরিমতী কান্নার সুরে বলল, এক মাস হতে চলল রে বেন্দা। রাত এলেই আমি জব্দ রে। ওরে বেন্দা, আমি চিরকালের রাতচরাণী— আমার এ বিপদ কেন হল রে ?

বেন্দা দেখল, মেয়েমানুষের কাঁদুনি একবার শুরু হলে এই নদীতে যতক্ষণ না বান ডাকাবে, ততক্ষণ থামবে না। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু দিন ফুরুলেই যে কানা হয়ে যায় রাতের মতো, সে কোন আক্কেলেই বা ঘর ছেড়ে বেরোয় ? তাও সহজ বেরুনো নয়, নদী পেরিয়ে পীরিতের নাগরের কাছে গিয়ে হাজির। বোঝা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। নৈলে ওর কাছেই মনের সুখে রাত কাবাড় করে ভোরবেলা লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি ফিরত।

বেন্দা হাত বাড়িয়ে বলল, কই। ওঠ। আমাকে ধরে-ধরে এস।

হরিমতী গুনগুনানি বন্ধ করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওর হাত ধরল। বেন্দাও এখন খুব লক্ষ্মী ছেলে। যেতে-যেতে হরিমতী ওর হাতে জড়ানো পট্টি ছুঁয়ে আস্তে বলল, পুলিশে খুব মেরেছিল তোকে রে! এখনও ব্যথা আছে বাবা ?

বেন্দার মন নরম হয়ে গেল। বোষ্টুমীর মনটা বরাবর বড্ড ভাল। বেন্দা নরম স্বরে বলল, তা একটু-একটু আছে এই দেখ না—যাচ্ছি বটে, কিন্তু সমান তালে কি পা পড়ছে ? খোঁড়াচ্ছি কেমন, দেখনা। হাত-পা দুই-ই ঠুঁটো।

পায়েও মেরেছে সোনা ? বলে হরিমতী অন্য হাতটা দিয়ে উরু ছুঁল।

বেন্দা বলল, ও পায়ে না। বাঁ পায়ে ব্যথা।

চল্ বাপ পা চালিয়ে। দাওয়ায় উপুড় হয়ে শুবি। লম্পর তেল মালিশ করে দেব।

নদীর ভাঙা পাড়ের ঢালু বেয়ে হরিমতীকে ওঠাতে যত, নিজেকে ওঠাতেও তত কষ্ট হল বেন্দার। নিচু বাঁধে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল দুজনে। এবার হরিমতীর হাত বেন্দার কাঁধে। চলতে চলতে হরিমতী মুখ খুলে দিল।...বাবুর বাগানের পুরনো কথা ফুল-ফলের কথা। তারপর বাবুর শাসানির কথা। বেন্দার কান শুনছে না। মন উদাস-উদাস লাগছে। চাঁদটা মাথার ওপর চলে এসেছে প্রায়। বাঁয়ে ওপর মাঝে-মাঝে ঘন ছায়া আর জ্যোৎস্নার টানা-পোড়েন চলেছে। বাঁয়ে নদীর ওপারে ধু ধু মাঠে আলোআঁধারি ধূসরতা। কী একটা পাখি ডাকছে কোথায়। ডাইনে ক্ষেত, ঝোপঝাড়, গাছগাছালির ওধারে গ্রাম এখন নিঃঝুম। কুকুর ডাকছে চৌকিদারের বাড়িতে। একটা লণ্ঠনও দেখা গেল দুলতে-দুলতে মিলিয়ে যেতে। ভাঁড়ুলে গাছটার কাছে এসে বেন্দা ভাবল, বোষ্টুমীকে সেদিনকার ঘটনাটা বলবে। কিন্তু বোষ্টুমী বকবক করছে আপন খেয়ালে। এইসময় হাওয়ার ঝাপটায় গ্রাম থেকে অজু নাপিতের কেত্তনে দলটার ঝাঁকবেঁধে গাওয়া গানের কলি আর খোলের শব্দ ভেসে এল। মিলিয়ে গেল। আবার ভেসে এল। আবার মিলিয়ে গেল। বোশেখ মাসটা গোটা এরকম চলবে।

আগড় ঠেলে 'বাবুর বাগানে' অর্থাৎ নিজের বাড়িতে ঢুকে হরিমতী চাপা গলায় বলল, নেশাটুকুন কখন চটে গেছে বুঝলি বেন্দা? পেলে আবার খেতুম, তোর দিব্যি! তারপর চাপা খিকখিক হাসি।

বেন্দা বলল, আমারও ইচ্ছে করছে। একটুখানি ভাবতে দাও বোষ্টুমীমাসি।

দাওয়ায় উঠে বেন্দার কাঁধ থেকে হাত তুলে হরিমতী আঁচলের গিটে বাঁধা চাবি ঝনঝনিয়ে তালা খুলল ঘরের। নিজের ঘরসংসার বলে সবটাই মুখস্থ ছড়ার মতো। ভেতরে ঢুকে তালাই আনল। লম্প আনল হিস হিস করে হেসে বলল, যুধোর শলাই বাকশোটা নিয়ে এসেছি। মিনসে মড়া হয়ে পড়ে আছে নদীর পারে। সকালে খুব গালমন্দ করবে।

বেন্দার কানে গোঁজা সিগারেটটার কথা মনে পড়ল। দ্রুত কান খুঁজে সেটা পেয়ে খুশি হল। বলল, দাও। আমি জ্বালি

লম্পটা চৌকাঠের ওপারে ঘরের মেঝেয় ঠেলে দিয়ে হরিমতী পা ছড়িয়ে বসল।...রাতকানা হয়ে মনে শান্তি নেই, বাবা। তারপর সিগারেটের গন্ধ পেয়েই নড়ে উঠল। ফিক করে হেসে বলল ফের. দিস মাসিকে ছুটান। গন্ধটা বেশ ভাল।

লম্পের আলো হরিমতীর আদ্ধেক শরীরে পরেছে। বেন্দার ইচ্ছে হল, বোষ্টুমীমাসিকে আরও খুশি করবে। বলল, খাওয়াদাওয়া কী হল যুধোর ঠেঞে? না হলে বলো, একখানা পাঁউরুটি আছে সঙ্গে। সকালে খাব বলে রেখেছি।

হাত বাড়িয়ে হরিমতী বলল, দে না, খাই। আজ ভাত-টাত খাইনি। দুপুরে মোড়লগিন্নি দুখানা পিঠে দিয়েছিল। ভাত খাব বলে যুধোর কাছে গেলুম। তো কপাল, মিনসে পাঁউরুটি আর বেগুনের ঝোল খেয়েছে। সেই ঝোল দিয়ে তাড়ি খেলুম। তারপর বাবুর মেয়েরা গিয়ে পড়ল।

কথা বাড়তে না দিয়ে বেন্দা পাছার দিক থেকে নেংটির কোণায় বাঁধা পাঁউরুটির টুকরো খুলে বলল, খাও। শক্ত লাগবে। জলে ভিজিয়ে খাও বরঞ্চ।

হরিমতী হাসল। আমার দাঁত খুব শক্ত রে বেন্দা।

তাহলে খাও।

খাই। হরিমতী কুড়মুড় করে পাঁউরুটি চিবুতে থাকল। সিগারেটের কথা মনে পড়িয়ে দিতে ভুলল না। বেন্দা এখন লক্ষ্মী ছেলে। আধখানা পুড়লে ঘষটে নিবিয়ে রাখল। হরিমতী চিবুতে চিবুতে বলল ফের, তোর মতো কেউ সঙ্গে থাকলে আমার কি ভাবনা ছিল? আগের মতো বাঘিনী হয়ে বেড়াতুম।

বেন্দা গলার ভেতর আবেগ রেখে ঢোক গিলে বলল, তুমি ঠাঁই দিলে সঙ্গে থাকব না তো কি? আমার আর কে আছে বলো? মাসি আপন মায়ের বোন বটে, কিন্তু শত্তুর।

থাকবি বেন্দা ?

হুউ।

পাঁউরুটি খেয়ে ঘরে ঢুকে মাটির ঘড়া থেকে এনামেলের খুরিতে জল ঢেলে ঢকঢক করে খেল হরিমতী। বেন্দার পরমায়ু প্রার্থনা করল। তারপর তেমনি করে বসে সিগারেট চেয়ে নিল। রাতকানা মানুষ—কিন্তু লম্পের আগুন টের পাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে ফুঁক ফুঁক করে ধোঁয়া ছেড়ে হরিমতী কেমন ভংগিতে হাসতে লাগল।

সেই কাল হল বেন্দার। যাকে মাসি বলেছে, তার দিকে কু-চোখে তাকাতে মনে ঢেঁকির পাড় পড়ে। কিন্তু কী সুন্দর মেয়েমানুষ দেখাচ্ছে হরিমতীকে। বিভ্রান্ত বেন্দা বলল, পায়ে ব্যথা না থাকলে কানুর গাছগুলোতে চড়ে এক্ষুনি মাল সাবাড় তুম। চারটে গাছ কুড়ুলে এক হাঁড়ি কি হবে না ? বিকেলে নামিয়েছে—এতক্ষণ অনেকটা ঝরে ভাঁড়ের তলা ভরে উঠেছে। তোমার ঘরে হাঁড়ি নেই বোষ্টুমীমাসি ?

হরিমতী বিহ্বলতায় চঞ্চল হয়ে বলল, আছে।

একটি দড়িও দাও। হাঁড়ির মাথায় বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠতে হবে তো। কবে একটা ছাগল পুষেছিল হরিমতী। শেয়ালের ভোগে লেগেছিল বিশ টাকার মাংস। সেই থেকে আর ওপথে পা বাড়ায় নি হরিমতী। ইদানিং আর শেয়াল নেই এতদঞ্চলে। বাগদীপাড়া-কুনাইপাড়া-বাউরিপাড়ার মেয়েরা মিলে ছাগলপালন কোঅপারেটিভ করেছে কমলাক্ষ প্রমুখের উদ্যোগে। সরকার একটি প্রকাণ্ড সদ্বংশীয় পাঁঠা উপহার দিয়েছেন। মধুপুরে ব্যাংক বসেছে। ব্যাংকের টাকায় চলছে ছাগলপালন। হরিমতী এসবেও নেই। ভিড়ের দিকে পা বাড়াতে তার চিরকাল বড় অনিচ্ছা।

চালের বাতা ঢুঁড়ে দড়িটা পেল বেন্দা। একটা হাঁড়িও পেল। পা বাড়িয়ে সে জানাল, ব্যথাটা আর নেই যেন। জ্যোৎস্নারাতে ছায়ার রঙ ঘন কালো। সেই কালোর ভেতর আত্মগোপন করে সে হাঁটতে থাকল। সামনের 'জোল' অর্থাৎ নিচু জমিগুলোর ওপরদিকে

তাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো। চাঁদের আলোয় বিদঘুটে লাগে তাদের চেহারা। বেন্দা জানে, কয়েকটা বাঁজা গাছ মালিকদের কাছে ভাড়া নিয়ে তাড়ি লাগিয়েছে কানু কুড়র। রোজ বিকেলে বেচতে যায় মধুপুরের বাজারে। ড্রাইভাররা লরি দাঁড় করিয়ে দু-চার গ্লাস করে গিলে যায়। কানু লাল হয়ে যাচ্ছে বলে বেন্দার ধারণা।

বেন্দা চলে গেলে আন্দাজ করে পা ফেলে হরিমতী জ্যোৎস্না ধোয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। দৈবাৎ ধরা পড়লে বেন্দা কি তার নাম করবে? করুক। কেউ বিশ্বাস করবে না। বেন্দা ছোঁড়ার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

হাওয়ার ঝাপটানিতে আবার গ্রাম থেকে ভেসে এল কীর্তনের কলি আর খোলের বাজনা। অজু নরসুন্দরের গলাটা স্পষ্ট বোঝা গেল। বাবুর বাড়ির সামনে হয়ে দলটা সদ্গোপপাড়া ঢুকেছে।

হরিমতীর স্মৃতি এল ঝাঁপিয়ে। এই উঠোনে কতটা রাত অব্দি এই ধম্মমাসে কিংকর বোরেগী কেত্তনের আসর বসাত। হরিমতীর দাওয়ায় তখন কত মেয়ের ভিড়। গিন্নীর মতো হরিমতীর তখন চলন-বলন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি তার আঁচলে। যে চাইছে, বিলি করছে। কোনো কোনো রাতে জিরেনের সময় বেন্দার বাবা হরিবলা 'রস' গাইত কবিয়ালের ঢঙে। ...'রা-ধে-লো তোর ভাঁড়ার ঘরে বেড়াল ঢুকেছে—এ—এ—এ......'

দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙেছে—এ—এ—এ......

কালো বেড়াল ধরবে কে—এ—এ—এ.....

হরিবোলা ছিল সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ। বোঝাই যেত না তার পেটে পেটে এত রস। বেন্দার মতোই রোগাটে গড়ন ছিল। অমনি টানা চোখ, সরু খাড়া নাক। ভুলেও নিরিবিলি হাত ধরতে আসেনি হরিমতীর। ধরলে হরিমতীর আপত্তি হত কি? হয়তো হত না। হরিমতী জানত, সে বাঁজা মেয়ে। তার ভয়ডর ছিল না। কিন্তু তাই বলে হরিমতী বেশ্যা না। ভগবান আছে মাথার ওপর, সে জানে—হরিমতী খানকি মেয়ে না। খানকি হলে হরিমতীর কি এ

বয়সে ভাত কাপড়ের অভাব হত? মনে যাকে ধরেছে, তার কাছে যেতে হরিমতীর আপত্তি হত না—এই যা। তার জন্যে হরিমতীকে বেবুশ্যে খানকি বললে হরিমতী তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

পুরনো কথা ভাবলে আজকাল হরিমতীর কান্না আসে। হায়, যে হরিমতীর বুকের পাটা ছিল কিংকর বোরেগীকে বাড়ী এলে ঠাঁই দেওয়ার, সেই হরিমতী যায় মনের জ্বালা জুড়োতে নদী পেরিয়ে যুধোর কুঁড়েঘরে? সে দিনকাল সে বয়স থাকলে যুধো তার বাড়িতেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকত।

এইসব ভাবতে গিয়ে হরিমতীর মাথায় ভেসে এল বেন্দার কথা। অমনি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। আ ছি ছি। পেটের ছেলেটা। মাসি বলে ডাকে।

বেন্দা এল যখন, তখন হরিমতী দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বলল, পেলি?

হুঁও। পাত্তর বের করো। একখানা ন্যাকড়া দাও—ছাঁকনি করি। ডেঁয়ো পিঁপড়েতে ভর্তি।

হরিমতী বলল, আমার আঁচল জড়িয়ে নে হাঁড়ির মুখে। পোস্কের কাপড়। আর লম্ফ নিয়ে খুরি দুটো আন ভেতর থেকে।

কাপড় কতটা 'পোস্কের', তা টের পাচ্ছে বেন্দা। কিন্তু আর হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই। লম্প হাতে হরিমতীর ঘরে ঢুকে সে চঞ্চল দৃষ্টি বুলোতে থাকে এদিকে-ওদিকে। ঘরে তেমন কিছু নেই, যাতে চোখে পড়ে। মাটির ডেয়োঢাকনা কিছু, দুটো ছেঁড়া শাড়ি, একটা শায়াও আছে বটে। আর একটা কাঠের বড় বাকসো। কী আছে ওতে? তেমন কিছু থাকলে কি হরিমতীর না খেয়ে দিন কাটত?

একটু লজ্জা পেল বেন্দা। আজকাল শালা কী এক দৃষ্টি হয়েছে চোখের, মনের হয়েছে কী এক ছোঁক্-ছোঁকানি। হরিমতী এখন তার আপনজন।

লম্প নিবিয়ে দুজনে ভাগ করে খেল তাড়িটা। দু'খুরি করে ভাগে

পড়ল। শেষ খুরিটা হরিমতী বলল ভাগাভাগি খেতে। আগে খেল বেন্দা, শেষে হরিমতী। তারপর হরিমতী হাসতে হাসতে বলল, এঁটো খাওয়ালি বেন্দা।

বেন্দা বলল, জানলে আরেকটা সিগারেট কিনতুম। আমার আজ পয়সার অভাব নেই বোষ্টুমীমাসি।

সে বাবুর বাঁশবনের বৃত্তান্তটা আগাগোড়া শোনাল। হরিমতী খি খি করে খুব হাসল। তারপর বলল, কাল তাহলে আমরা ভাত খাই, কী বলিস বেন্দা?

খাব। ভাতের জন্যে আমারও মনটা হু হু করছে।

ও বেন্দা, তোর ভাত আর আমার মাংস।

মাংস? কোথায় পাবে মাংস?

হরিমতী আবেগে বেন্দার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, কুঁড়পুকুরে হাঁসগুলো চরতে চরতে কেলান্ত হলে পাড়ে উঠে ঝিমোয়। বাঁশবনের ভেতর কঞ্চি হাতে করে বসে থাকব। তারপরে মারব মাথায় পট করে এক বাড়ি...খি খি খি খি....

হাসতে হাসতে সেখানেই লুটোল হরিমতী। বেন্দা তারিফ করে বলল, তোমার বুদ্ধি খুব ভাল। তা এবারে শুই। বলে মুণ্ডু ঝুঁকিয়ে চাঁদের অবস্থান দেখে নিল।

শো। এখানেই শো। বলে হরিমতী একটু সরে তালাইয়ে জায়গা দিল।

বেন্দা শুয়ে বলল, আমার শরীরে কেরাচিন মালিশ করে দেবে বলেছিলে যে?

অ। তা শো। দিচ্ছি।...সে উঠে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, দেখছ? দোর আটকানো নেই। সে নিভে থাকা লম্প ছুঁড়ে দরজায় আগের মতো তালা এঁটে বেন্দার পাশে বসল।

বেন্দা বলল, তোমার ঘরে নেবেটা কী চোরে?

হরিমতী লম্পের সলতের তেল হাতে মাখতে মাখতে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিকই বলেছিস বেন্দা। কই, উপুড় হ, দেখি।

উরু থেকে পায়ের পাতা মালিশের ভংগিতে টিপে দিচ্ছিল হরিমতী। কখনও বাচ্চাছেলের মতো হেসে উঠছিল বেন্দা—মাইরি! কাতুকুতু লাগছে! কখনও ককিয়ে উঠছিল—উহু হু! ব্যাথা, ব্যাথা। উঠোনে সাদা জ্যোৎস্না। বাবুর বাগানের গাছে-ঝোপে গ্রীষ্মরাতের উদ্দাম বাতাসের শনশনানি। কীর্তনের দলটা কখন যে-যার বাড়ি ফিরে কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তারপর নদীর ওপারে দূরে শেয়াল ডাকল। ঢুলতে ঢুলতে হরিমতী গড়িয়ে পড়ল। বেন্দা ঘুমোয় নি। ঘুরে চিত হয়ে শুল। তার মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা। তার ভালোগুলো মন্দ এবং মন্দগুলো ভালো হয়ে যাচ্ছে। দুবার সে সাবধানে হাত বাড়িয়ে ছুঁল হরিমতীকে। তৃতীয়বার ডান হাত থেকে ন্যাকড়ার পট্টিগুলো খুলে ফেলল। তারপর মাথা তুলে দেখল বুকের অদ্ধেকটা উদোম হয়ে আছে হরিমতীর। বুকটা ছুঁয়ে বেন্দার বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। সে একটু চাপ দিল। তবু জাগল না হরিমতী। হরিমতী তার কে?

সাহস্ করে বেন্দা হরিমতীকে কাছে টানতে লাগল। কিন্তু হরিমতীর যেন মরণ ঘুম্। কোন সাড়া নেই।...

দু'টাকায় কেনা মজা

কমলাক্ষ বললেন, ও অন্ন! তোর বোনপোর কীর্তি দেখে আয় গে বোষ্টুমীর বাড়ি।

অন্ন কোমরে আঁচল জড়িয়ে কলতলায় থালা মাজছিল। মুখ না ঘুরিয়েই বলল, আমি কী দেখব? আপনারাই দেখুন।

কমলা বারান্দায় থামের কাছে হাত পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ হাওয়া-বাতাস বন্ধ। গাছ গাছালি আর আকাশ থমথম করছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। বললেন, কী রে অন্ন?

বাবুকেই জিজ্ঞেস করুন না। অন্ন বাঁকা মুখে জবাব দিল।

কমলাক্ষ চোখ নাড়িয়ে বললেন, হরিমতী বোষ্টুমী নতুন মানুষ তুলেছে ঘরে।

কমলা বাঁকাঠোঁটে গলা চেপে বললেন, ও। তাতে তোমার বড় অসুবিধে হচ্ছে বুঝি ?

জিভ কেটে কমলাক্ষ বেরিয়ে গেলেন দ্রুত। মাঠে তিলক্ষেতে নিড়ান দিচ্ছে মুনিশেরা। আউস আর পাটের চারা শুকিয়ে যাচ্ছিল। টিউবেল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু পাতাল জলের গতিক ভাল না। পৃথিবীর ভেতরটা খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে। ডোমন মোড়লের ছেলে সুখেন মধুপুর স্কুলের মাস্টার। সে এখন সহকারী অঞ্চল প্রধান। মাঠের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের যে লাইন গেছে, সেখান থেকে ট্রান্সফর্মার বসিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে ডিপটিউবেল এবং নদীতে বাঁধ দিয়ে ইরিগেশন পাম্পিং স্টেশনের জন্য সে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কমলাক্ষ সুখেনের ভরশায় দিন গুনছেন।

বাবু বেরুলে অন্ন কাঁদো-কাঁদোমুখে বলল, ও বাবুদিদি! রাক্ষুসী মাগীর হাত থেকে আমার বেন্দাকে রক্ষে করুন!

ভূরু কুঁচকে কমলা বললেন, বেন্দা জুটেছে বুঝি বোষ্টুমীর কাছে ?

হ্যাঁ বাবুদিদি! অন্ন নোংরা হাতের উল্টো পিঠে নাক মুছে বলল। এ্যাদ্দিনে জানলুম, কে অমন ভাল ছেলেটাকে তলায় তলায় ফুসলানি দিয়ে মন্দ করেছে। বেন্দার কখনো চোর-চোট্টামী ছিল না। বলুন, ছিল ? আপনাদের বাড়িতে সেই এ্যাট্টুকুন থেকে মানুষ।

কমলা উদাস হয়ে বললেন, তা আমি কী করব ? তারপর ঘরের দিকে ঘুরে ডাকলেন, মঞ্জুরে!

পূর্বা ও মঞ্জু লুডো খেলছিল ঘরের ভেতর। দক্ষিণ-পুবের এই ঘরে হাওয়া খেলে সারাক্ষণ। নিচেই পুকুর। কিন্তু আজ বড্ড গুমোট চলেছে সকাল থেকে। পূর্বা হাঁফিয়ে উঠেছে। কলকাতায় প্রচণ্ড লোডশেডিংয়ে পাখা ঘোরে না বটে, এত বেশি গরম লাগে না। কাল ভোরের বাসে চলে যাবার কথা বলেছে সে। মঞ্জু বলেছে, যাওয়াচ্ছি।

এলেই খালি যাব-যাব। পূর্বা বলতে পারে না, তার রাত কাটানো কী কঠিন। একেবারে ঘুম হয় না গরমে।

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে মঞ্জু বলল, কী মা ?

কমলা বললেন, পূর্বাকে নিয়ে একবার দেখতো গণশাকে। কখন মাছ ধরবে, রান্নাবাড়াই বা হবে কখন ?

অনিচ্ছাসত্ত্বে মঞ্জু বেরুল। পূর্বা বলল, কতদূরে যাবে ?

কাছেই। বলে মঞ্জু পূর্বার গলা জড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার ভংগি করল। তার চাপে পূর্বা কাত হয়ে টাল খাচ্ছিল। সামলে নিল।

বলল, খুব জোর হয়েছে তো তোমার গায়ে।

মঞ্জু ফাজলেমির স্বরে বলল, হবে না ? এ তো তোমাদের কলকাতার পচা মাছ খেকো শরীর না। তুমি এখানে থাকলে তোমারও এমনি হত।

পেছনে অন্ন তখনও কান্নাকাটি করে বলছে ! রাক্ষুসী ! রাক্ষুসী ! পেটের ছেলেটা—মা-মাসি করে ডাকে। তাকে নিয়ে শুতে তোর লজ্জা হল না। ধিক্ ধিক্ ! শত ধিক্ বেবুশ্যে। ছেনাল !

কমলার ধমক খেয়ে সে চুপ করে গেল। রাস্তায় নেমে পূর্বা বলল, কী হয়েছে মঞ্জু ? মঞ্জু ফিস ফিস করে বলল, সেই বোষ্টুমীকে দেখলে না নদীর ওপারে ? আর বেন্দাকে তো দেখলে বাঁশ চুরি করতে। ওদের কথা বলছে।

ব্যাপারটা কী ?

প্রশ্ন শুনে মঞ্জু হেসে ফেলল। বুঝতে পারছনা এখনও ? কলকাতায় থেকে-থেকে তোমার মাথার ঘিলু টেসে গেছে পূর্বাদি ! বোষ্টুমী আর বেন্দাশালা …

বলে আঙ্গুলে আঙ্গুল আঁকড়ে মঞ্জু যে ভংগিটা করল, পূর্বার চোখে সেটা দস্তুর মতো অশ্লীল। সে মঞ্জুর পিঠে কিল মেরে বলল, অসভ্য মেয়ে কোথাকার !

মঞ্জু হাসতে হাসতে একটু সরে গেল। পূর্বার এখানে একটুও

ভাল লাগছে না। কলকাতায় থাকতে হঠাৎ-হঠাৎ এ গ্রাম, তাদের বাড়ি, অনেক অস্পষ্ট দৃশ্য ও ঘটনার স্মৃতি তার মাথায় ভেসে আসে। কিন্তু কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। এবার এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে আসার ইচ্ছে তার একটুও ছিল না। বাবার কথায় আসতে হল। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ভাল থাকলে রথ দেখা কলা বেচার মতো জন্মভূমিতে বেড়াতে আসা এবং কমলাক্ষের কাছে পাওনা টাকা যতটা পারা যায় আদায় করার আনন্দ লুঠতেন। পূর্বাকে পাঠিয়েছেন চিঠি লিখে। টাকার জরুরী দরকার। কিন্তু কমলাক্ষ একেবারে চুপ্ করে আছেন! পূর্বার পক্ষে মুখ ফুটে তাগিদ দেওয়া অসম্ভব। কেনই বা দেবে? বাবার চিঠিটাই যথেষ্ট।

ঘোরালো মাটির রাস্তা খটখটে শুকনো। মধ্যিখানে গরম ধুলো। কিনারায় গাছ-গাছালির ছায়া, ঘরবাড়ির ছায়া। সেই ছায়ায় দুটিতে হাঁটছে বাঁদিকে আগাছার ভেতর পায়চলী পথ ধরে এগিয়ে মঞ্জু বলল, গণশাকে বলে বোষ্টুমীর বাড়ী যাবে পূর্বাদি?

পূর্বা অবাক হয়ে বলল, কেন?

চলো না! বেন্দা আর বোষ্টুমীকে দেখে আসব।

সে কী!

মঞ্জু চাপা হাসছিল। হাসিটা পূর্বার কাছে বেজায় অশ্লীল। গ্রাম সম্পর্কে তার ধারণা বরাবর ভাল নয়। মঞ্জুকে এবার এসে যতটা ভাল ভেবেছিল, মঞ্জুও যেন ততটা ভাল নয়। পূর্বার মতে, সেক্সটেক্স নিয়ে কথা বলা দোষের কিছু নয়—কিন্তু সেক্স-বিষয়ক কথাবার্তার ভংগিটাই আসল কথা। মঞ্জুর ভংগী—অর্থাৎ এক্সপ্রেশনটাই অশ্লীল মনে মনে বিরক্ত হয়ে পরে পূর্বা ভাবল, আসলে মেয়েটা তত লেখাপড়া শেখেনি এবং গ্রামে পড়ে আছে। তাই এক্সপ্রেশন এমন অমার্জিত।

মঞ্জু বলল, তুমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি পাঁচিলের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে আসব ওরা কী করছে।

পূর্বা অনিচ্ছায় হেসে বলল, তুমি ভীষণ পেকে গেছ মঞ্জু! ছিঃ।

ছিঃ কিসের? মঞ্জু চঞ্চল চোখে তাকিয়ে বলল। আর পেকেছি

তো পেকেছি। পাকবনা? আমি কি তেমন কচি খুকি হয়ে আছি আগের মতো যে গাল টিপলে দুধ বেরুবে?

গণেশের বাড়ি উঁচু ভিটের ওপর। একদিকে গভীর শুকনো খাল। বাঁশের সাঁকো আছে খালে। গণেশের বউ একটা মাটির তেলো হাতে নিয়ে সাঁকো পেরুচ্ছিল। কোলে বাচ্চা। বলল, বাবু দিদি যে।

মঞ্জু তার মায়ের ভংগিতে বলল, তোমার বর কী ভেবেছে বলো তো বউ? কখন জাল নিয়ে যাবার কথা।

গণেশের বউ বলল, গেছে তো। কোন বাগে এলেন আপনারা? দেখা হল না পথে?

মঞ্জু বলল, না।

গেছে। এই তো আমিও যাচ্ছি।

গণেশ খেয়াজাল নিয়ে জলে নামলে তার বউ সামনের দিক থেকে সাঁতার কেটে জল নাড়তে নাড়তে আসবে। তখন জাল তুলে ধরবে গণেশ। দুখানা বাকানো বাঁশে বাধা জালে মাছ ঝকমক করবে। বাচ্চাটা পাড়ে আপন মনে খেলা করবে গাছের ছায়ায়।

বাগদীপাড়া নিঃঝুম হয়ে যাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে নিচু 'জোল' জমি পেরিয়ে দুজনে গাছপালা ঢাকা জঙ্গুলে জায়গায় পৌঁছুল। এখানে ভাঙাচোরা একটা শিব মন্দির আছে। গাজনের সময় চৈত্র সংক্রান্তিতে যা একটা দিন পুজো আর পাঁঠাবলি হয়। এবারকার গাজনে কাটা পাঁঠা পড়েছে, সেইসব গল্প করতে করতে মঞ্জু হঠাৎ নাক উঁচু করে বলল, দারুণ গন্ধটা না?

পূর্বা বলল, কিসের বলো তো?

ওই যে কাঠমল্লিকার। আমাদের বাগানের। আঙুল দিয়ে দেখাল মঞ্জু। ফের বলল, ওখানেই তো বোষ্টুমী থাকে।

পূর্বা আনমনে বলল, হুঁ। জানি।

বাবা বোষ্টুমীকে তাড়িয়ে দেবেন, জানো?

সে কী। কেন?

ওখানে ধান চাষ হবে।

পূর্বা অবাক হয়ে বলল, 'বাবুর বাগান' এটাই তো ?

হ্যাঁ। মঞ্জু হাসল। কোন বাবুর ভেবেছ তুমি ? আমার ঠাকুর্দার নামে নাম। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও পূর্বাদি। আমি উঁকি মেরে দেখে আসি।

মঞ্জু দৌড়ে খেঁকশেয়ালের মতো অথবা খরগোসের মতো চলে গেল। শুকনো পাতায় খুব শব্দ হল। তারপর স্তব্ধতা। বাতাস বইছে না। কিন্তু কাঠমল্লিকার মিঠে গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। হঠাৎ পূর্বার মনে পড়ে গেল সবুজ সাপটার কথা। তখন ভয়ে-ভয়ে সরে গিয়ে শিবমন্দিরের সামনে ছায়াঢাকা চটানে দাঁড়াল। তারপর দেখল মঞ্জু কাঠমল্লিকা গাছটার নীচে নীচু পাঁচিলের একটা ভাঙা জায়গার সামনে হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। বারবার হাসিমুখে পূর্বার দিকেও ঘুরছে। কী দেখছে মঞ্জু ? অশ্লীল কিছু কি ? পূর্বা টের পেল, তার মনেও আবছা একটা ভয়-লজ্জা মাখা কৌতূহল সুড়সুড়ি দিচ্ছে। মঞ্জু ঘুরে হাতছানি দিয়ে ডাকলে সে আর স্থির থাকতে পারল না। মঞ্জুর কাছে চলে গেল।

মঞ্জু ফিস ফিস করে বলল, বোষ্টুমী চুল খুলে বসে আছে। আর বেন্দা উকুন তুলে দিচ্ছে,—নাকি পাকা চুল। বোঝা যাচ্ছে না। দেখ না, কী মজা।

পূর্বা উঁকি দিল ফাটল দিয়ে। দাওয়ায় দুপা সামনে ছড়িয়ে বসে আছে হরিমতী। তার পিঠের কাছে বসে তার চুল ঘাঁটছে সেই বেন্দা। চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে ওরা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কী কথা বলছে।

পূর্বা খারাপ কিছু দেখবে ভেবেছিল। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। ভ্যাট্। কোনো মানে হয় ? সঙ্গে সঙ্গে হরিমতী তাকে দেখতে পেয়ে বলল, কে গো ?

মঞ্জু অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোষ্টুমীকাকী, আমরা !

হরিমতী ধুড়মুড় করে উঠে এগিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, ভেতরে

এস। আদাড়ে কেন বাছা? ফুল কুড়োচ্ছি বোষ্টুমী কাকী। মঞ্জু গম্ভীর মুখে বলল।

হরিমতী হাসতে লাগল।······বাবুর মেয়ের এখনও সেই স্বভাব। ফুল কুড়োচ্ছে। ভেতরে এস। পোস্কের জায়গায় এই দেখ না— কত ফুল! আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি। এস।

ফাঁক গলিয়ে মঞ্জু সহজে ভেতরে চলে গেল। পূর্বার পক্ষে এটা কঠিন কাজ। মঞ্জু তার হাত ধরে অনেক টানাটানি করে ভেতরে নিয়ে গেল. ফুলের গালিচা যেন জায়গাটা। হরিমতী বলল, দাওয়ায় গিয়ে বসো মা তোমরা। আমি কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

দাওয়া থেকে বেন্দা তখন সাঁৎ করে ঘরে ঢুকে গেছে। মঞ্জু গিয়েই ডাকল, এ্যাই বেন্দাশালা! বেরো। বেন্দা ভেতর থেকে আস্তে সাড়া দিয়ে বলল, কী?

তুই এখানে জুটেছিস যে?

পূর্বা ঘরের সামনে গিয়েই পিছিয়ে আমগাছটার তলায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

বেন্দা বেরিয়ে লাজুক হেসে বলল, মাসি তাড়িয়ে দিলে তো কী করব? অন্তত রেতের বেলা একটা শোবার জায়গা তো চাই মানুষের। বোষ্টুমী বললে, আমার কেউ নেই। তুই থাক আমার কাছে। থাকলুম।

হুঁউ। মঞ্জু দাওয়ার খুটিতে হেলান দিয়ে মুখ টিপে হাসল। বুঝতে পারছি বেন্দা, এবার তুই বোষ্টুমী কাকীকেও পুলিশের ঠেঙানি খাওয়াবি।

বেন্দা প্রতিবাদ করল।··· না না। বোষ্টুমী কী করেছে যে ওকে মারবে?

তারপর সে দাওয়া থেকে নেমে আমগাছটার তলায় গিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, ও কলকাতার দিদি! দুটো টাকা চেয়েছিলুম। দেন না দয়া করে!

পূর্বা কী বলতে যাচ্ছিল, মঞ্জু এসে থাপ্পড় তুলে বলল, চোপ্

শালা! মুখ ভেঙে দেব। কোন মুখে টাকা চাইছিস আর? ওদিন যে বাঁশখানা কাটলি, ওতেই হয়ে গেছে।

হরিমতী কাঠমল্লিকা ফুল কুড়োতে-কুড়োতে বলল, বেন্দা! উ কি স্বভাব বাপু তোর? চাইবি যদি, মধুপুরের বাজারে গিয়ে বস্। এখানে জায়গা হবে না বলে দিচ্ছি।

বেন্দা বলল, তুমি থামো তো! কলকাতার দিদির কাছে আব্দার করে চাইছি। ছোটবেলায় ওনাকে একদিন কোলে করে কাদারাস্তা পার করে দিয়েছিলুম না?

মঞ্জু বলল, মিথ্যে কথা।

পূর্বা বলল, না। সত্যি। আমার মনে পড়ছে।

বেন্দা বলল, আর মঞ্জুদি—তুমিও বলো, কী না করেছি তোমার জন্যে? পাখির ছানা পাড়তে যেই গাছের গর্তে হাত ভরতে যাচ্ছি, উরে ব্বাস! কালসাপ ফোঁস করে উঠেছে। মনে পড়ছে!

মঞ্জু বলল, পড়ছে না।

বেন্দা চোখ বড় করে বলল, দোহালির বিলে তোমার জন্যে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে ডুবে মরছিলুম, মনে পড়ছে না?

না।

বেন্দা অভিমান দেখিয়ে বলল, তা মনে পড়বে কেন? বড় ঘরের মেয়ে তুমি। মন খুব বড় কিনা। গরীব ঘরের ছেলের সব মনে আছে।

বলে সে ফ্যাঁচ করে হাসল। চাপা গলায় বলল ফের, ও মঞ্জুদিদি! 'পাম্মিশেন' দাও—আরেকখানা বাঁশ কাটি। ছোট দেখে। বড় না —ছোট বাঁশ।

পূর্বা হাসছিল ওর কথা শুনে। মঞ্জু বার কতক চোপ বলার পর হরিমতীকে বলল, বোষ্টুমীকাকী! বেন্দাকে সামলাও। বাঁশ কাটবে বলছে আবার। এবার কিন্তু বাবার কানে তুলে দেব।

পূর্বা বলল, 'পাম্মিশেন' চাইছে মঞ্জু! বুঝতে পারলে? পারমিশান! ও বেন্দা, জানো কথাটার মানে কী?

বেন্দা একগাল হাসল। বাবুরা বলেন। শুনে শিখেছি।

হরিমতী উঠে এসে বলল; কৈ আঁচল পাতো।

অনেক ফুল কুড়িয়েছে হরিমতী। মঞ্জু একসময় ঠাকুমার পুজোর ফুল এখান থেকেই নিয়ে যেত। পুজোর ফুল আর ফোটে না বাবুর বাগানে। মঞ্জুর মায়ের পুজোর ফুল খিড়কির পুকুরপাড়ে অঢেল ফোটে। না ফুটলেও কমলারাণী হরিমতীর বাড়ির ফুলে পুজো করতেন না।

আঁচলে ফুল নিল মঞ্জু। পূর্বা বলল, মঞ্জু! পাতাশুদ্ধ কয়েকটা থোকা পাড়তে বলো না!

বেন্দা শোনামাত্র চলে গেল। গাছে উঠে চারটে ভেঙে তক্ষুনি এনে দিল। হরিমতী বলল, ও মঞ্জু! তোমার বাবা উচ্ছেদ করতে চাইছেন, জানো?

মঞ্জু একটু হাসল। তারপর চাপা গলায় বলল, সুখেনদাকে গিয়ে বলো না বোষ্টুমীকাকী। সুখেনদাকে বাবা ঠেলতে পারবেন না।

তারপর সে পূর্বার হাত ধরে টেনে হনহন করে চলতে থাকল। পূর্বা পাতাশুদ্ধ থোকাগুলো নিয়েছে। পেছন পেছন বেন্দা এগিয়ে বলল, কখন যাব কলকাতার দিদি? এক্ষুনি যাই?

মঞ্জু ঘুরে শাসাল। এক পয়সাও পাবি নে। বাঁশেই শোধ।

শিব মন্দির পর্যন্ত এসে বেন্দা ক্ষান্ত হল। দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত রেখে। বড়বাবুর কলকাতার মেয়েটার ওপর তার খুব রাগ হয়েছে। ফুলের থোকা টাটকা পেড়ে দিল! তবু মুখ ফুটে বলল কি অন্তত একটা টাকাও দেবে? ঠিক আছে। আমার নাম বেন্দা।

কিন্তু পূর্বার দ্বিধা মঞ্জুর জন্য।

বিকেলে পূর্বা সেই দক্ষিণ পূর্বকোণের ঘরে জানলার পাশে চেয়ারে বসে সঙ্গে আনা একটা উপন্যাস পড়ছে। মঞ্জু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। চোখের কোনা দিয়ে পূর্বা দেখল, জানলার বাইরে কেউ এসে দাঁড়াল। ঘুরতেই বেন্দার চোখে চোখ পড়ল। মঞ্জুর দিকে

ইসারা করে চোখ টিপে সে হাত পাতল।

হাসিতে গা ঘুলোচ্ছে পূর্বার। কিন্তু হাসতে পারল না। আহা, বেচারাকে দুটো টাকা দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু মঞ্জুর চোখ এড়ানো কঠিন হবে।

পূর্বা বলল, মঞ্জু! দেখ না চায়ের জল চড়িয়েছেন নাকি কাকিমা। ভীষণ চায়ের তেষ্টা হয়েছে।

মঞ্জু আনমনে 'যাই' বলে চিরুনী হাতে বেরিয়ে গেল। পূর্বা টেবিলের ওপর থেকে তার ব্যাগটা নিয়ে ঝটপট একটা দুটাকার নোট বের করে জানলায় গিয়ে বলল, নাও। চুপচাপ কেটে পড়ো!

বেন্দা তক্ষুনি খিড়কির দিকের কলাবনে উধাও হয়ে গেল।

মঞ্জু ফিরে এসে দেখে, পূর্বা আপনমনে হাসছে। বলল, চা হচ্ছে। তুমি হাসছ কেন পূর্বাদি?

পূর্বা বলল। এই বইটায় একটা মজার ব্যাপার পড়ছি। তারপর সে প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ল।—

মুজফফর ডাকু

সারাদিন থমথমে আবহাওয়ার পর কালবোশেখির আশা ছিল। এল অনেক দেরিতে। মধ্যরাতে। প্রথমে ধুলোর ঝড়, তারপর মেঘের ডাক নিয়ে দুর্ধর্ষ বৃষ্টি। অজু নাপিতের কেত্তনের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে-যার বাড়ি ঢুকে পড়ল। কত গাছের ডাল ভাঙল। কুনাইপাড়া-বাগ্দীপাড়ার ঘরের চাল উপড়ে গেল কয়েকটা। ঝড় কমেছে যখন, তখন সেদিক থেকে বৃষ্টির মধ্যে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল!

বেন্দা ও হরিমতী দুরুদুরু বুকে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মাসের গোড়ায় যুধিষ্ঠির প্রেমের বশে হরিমতীর ঘরের চাল মেরামত করে দিয়েছিল। তাই বাঁচোয়া।

ঝড় থামলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল আম কুড়োতে। ঘরের ভেতর শুয়েছিল ত্বটিতে। দাওয়া জলের ছাঁটে কাদা হয়ে গেছে। হরিমতী দরজা খুলে রেখেছে। মেঘ ডাকছে বারবার। বিদ্যুত ঝিলিক দিচ্ছে। রাতকানা হরিমতী এ ঝিলিক টের পাচ্ছে। তার খালি ভয় হচ্ছে, বেন্দার ওপর বাজ পড়বে না তো? এই চোর চোট্টা ছোঁড়াটা এ বয়সে তার বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়েছে। লোকের গঞ্জনার ধার কোনোকালে ধারে না হরিমতী। সে জানে, সে যদি মারা পড়ে, তার মড়া ফেলতে বাবুই শহর থেকে নিজের খরচায় ডোম আনবে। সেবার বানের জলে কিংকর বোরোগীর মড়া আটকেছিল দোহালির বিলে। সেখানেই শেয়াল শকুনে খেয়ে শেষ করছিল। মাথার খুলিটা নাকি অমর্ত কুড়িয়ে এনে বেগুনক্ষেতে বাঁশের ডগায় বসিয়ে রেখেছিল। হরিমতী বিশ্বাস করেনি। খুলি সব মানুষেরই একরকম। তবে গোবিন্দের মড়া গঙ্গা পেয়েছিল। কমলাক্ষের বাবা নলিনাক্ষ বড় ভালবাসতেন গোবিন্দকে।

একটু আগে হরিমতী বেন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছিল। আদরের বুলিগুলো অন্যের কাছে অশ্লীল মনে হবে। কিন্তু হরিমতীর জীবনে কত খাঁটি কথা ওগুলো। এ বয়সে খাওয়া-পরার কষ্ট, একলা থাকার কষ্টটাও বড্ড সাংঘাতিক—হরিমতীর এই স্বভাব। বেন্দা রোজগেরে না হলেও পুরুষমানুষ তো বটে। সঙ্গে আছে। কথাবার্তা বলছে। ভুল করে মাসি ডাকতে গিয়ে জিভ কাটছে। আবার হরিমতীর বেলাতেও তাই। বাবা-বাছা করতে গিয়ে সেও লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। এগুলো ক্রমে ক্রমে সয়ে যাবে। পরস্পর স্বজাতি নয়, রক্তের সম্পর্ক তো নেই-ই—তাহলে আর বাধাটা কিসের? সবাই জানে হরিমতী এরকম।

কিন্তু থাকবে তো বেন্দা? যতদিন না হরিমতীর মরণ হচ্ছে। এমনি করে থাকবে তো সঙ্গে? ঝড়জলের রাতে তালাইয়ে শুয়ে এই ভাবনাটা হরিমতীকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। বাবু যদি তাকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়েও দেয়, বেন্দা পাশে থাকলে হরিমতীর ভয় নেই। কেউ জানে

না, আমগাছটার তলায় শীতের সময় যে উনুন জ্বলে, তার হাতখানেক দূরে শিয়রের দিকে মাটির তলায় ছোট্ট একটা কাঠের বাকসো পোঁতা আছে। বাকসের মধ্যে শক্ত টিনের কৌটোর মধ্যে খানকতক সোনা-রূপোর গয়না আছে। উপোস করে থাকে পেটে কাপড় বেঁধে, তবু ওতে হাত দেয় না হরিমতী। ভাবে কোনো এক চরম সংকটের দিনে বাকসোটা নিশিরাতে তুলবে। কিন্তু কী সে সংকট, কেমন করে আসবে তার জীবনে, হরিমতী জানে না। ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলতে জ্বলতে কতবার গোবিন্দ মালীর খুরপিটা হাতে নিয়েছে, আবার রেখে দিয়েছে। টলতে-টলতে গেছে এবাড়ি ওবাড়ি দুমুঠো চাল ধার করতে। শোধ দেয় বলে ধার পেয়েছে। আর নিদেন ওই নদীপায়রর যুধিষ্ঠির তো আছেই।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে রা-বাক্যি বন্ধ। বেন্দাকে নিয়েছে বলে যুধিষ্ঠির দূর থেকে দেখলে মুখ নামায়। এখন ভাবনা, বেন্দা তাকে ছেড়ে না পালায়। বেন্দা গেলে আর কাকে পাবে হরিমতী ? তেমন কাকেও আনাচে-কানাচে দেখতে পাচ্ছে না। তাছাড়া তার বয়সও হয়েছে। চেহারায় আগের ঝিলিক নেই। তারসঙ্গে জুটেছে রাত কানা রোগটা। পছন্দসই আর কোনো পুরুষ তার দিকে তাকাতে নেই এতবড় পৃথিবীটাতে !

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হরিমতী ঠিক করল, ভালয়-ভালয় ফিরে আসুক বেন্দা। তারপর এ-কথা সে-কথা বলে বাজিয়ে দেখে নেবে বেন্দার মন। তারপর বলবে গোপন কথাটা।

হু, বলবে। কিন্তু কোথায় লুকোনো আছে, তা বলবেনা। বলবে, আমার কিছু সোনারূপো আছে। বেচে চল্ বেন্দা, কোথাও চলে যাই। বরঞ্চ, চল্ না কুনাইপাড়ার কাজলের মতো কলকাতায় !

রক্ত নেচে উঠল হরিমতীর। কলকাতার মেয়েটাকে বললে হয়, যেখানে থাকে, সেখানকার কী অবস্থা। কারুর বাড়ি ঝিগিরি করবে হরিমতী, বেন্দা করবে চাকরের কাজ। বড়বাবু মনমোহনের খবর হরিমতী রাখে। যত বড়াই করুক, বাবু গিন্নির কাছে শুনেছে, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বড়বাবু সর্বশান্ত। এখনও ছোট মেয়ে গলায় ঝুলছে।

দাওয়ায় একটা শব্দ হল। তারপর কেউ ঢুকল ঘরে। রাত কানা হলেও হরিমতী টের পেয়ে বলল, বেন্দা, আম পেলি নাকি রে?

বেন্দার বদলে অন্য কেউ গলার ভেতর বলল, আমি বোষ্টুমী, আমি। চেঁচিও না।

হরিমতী ধুড়মুড় করে উঠে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। গলাটা তার চেনা লেগেছে। কিন্তু ঠাওর হচ্ছে না। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, কে বাপু, এমন করে মেয়েছেলের ঘরে ঢুকলে?—সাড়াশব্দ নেই?

বোষ্টুমী, আমি মুজফর।

হরিমতী আতংকে কাঠ হয়ে বলল, মুজফর?

হ্যাঁ। আবার কে?

কাজটা ভাল হল না তোমার। এমন করে ঘরে ঢুকবে কেন বলো দিকিনি?

মুজফর ডাকু টর্চ জ্বালল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, আবার কাকে জোটালে বোষ্টুমী? তোমার মাইরি বয়স যাচ্ছে, রঙ যাচ্ছে না!

হরিমতী চুপ করে থাকল।

দাঁড়াও, জুতো খুলি। তাপরে বসব। মুজফর টর্চ নিভিয়ে কাদামাখা জুতো দুটো খুলে চৌকাঠের কাছে রাখল। তারপর পা দিয়ে তালাইয়ের ওপর থেকে বালিশদুটো ঠেলে সরিয়ে বসল। সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল ফের, নাও বোষ্টুমী। সিগারেট খাও।

হরিমতী ভয়ে-ভয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, রাতকানা রোগে ধরেছে। গুজে দাও হাতে।

মুজফর সিগারেট জ্বেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বলল, খুব বর্ষাচ্ছে! নাও বোষ্টুমী, আগুন নাও।

হরিমতী প্রাণের দায়ে সিগারেট ঠোঁটে নিল। মুজফর লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল। তারপর খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, তোমাদের বিছানা ভিজিয়ে দিলুম। আমার জামাকাপড় ভিজে একাকার হয়েছে।

বোষ্টুমী, তোমার পাশের শালা গেল কোথায় বলো? ও বোষ্টুমী!

হরিমতী আস্তে বলল, এক্ষুণি আসবে। আম কুড়োতে গেছে।

কে সে? নাম কী?

বেন্দা।

মুজফর ফের একচোট হাসল। ওরে শালা! সে তো তোমার পেটের ছেলের বয়সী। তার মাথাটিও খেলে! ভাল, খুব ভাল।

হরিমতী মনে জ্বলতে জ্বলতে বলল, তুমি বাপু কোত্থেকে জ্বালাতে এলে রাতদুপুরে?

মুজফর গলার ভেতর বলল, বিষ্টি ছাড়লে পালাব। ঝড় বিষ্টিতে ভাবলুম, বোষ্টুমীকে গিয়ে ওঠাই। এসে দেখি, দরজা খোলাই। ভালই হল। বন্ধ থাকলে দাওয়ায় বাস থাকতুম অগত্যা।

হরিমতী সাহস করে বলল, এমন করে যে বেড়াচ্ছ, পুলিশের পাল্লায় পড়লে কী হবে? জানো? সেদিন বাঁকা চৌকিদার এসে আমাকে জিগ্যেস করছিল তোমার কথা। আমি তো ভয়ে কাঠ।

মুজফর কান না করে বলল, কিংকর না মলে এখনও বাবুর বাগানে মুজফর কতবার আসত।

হরিমতী ওকে ভয় দেখাতে চায়। তাই ফের বলল, বেন্দাকে সেদিন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। খামোকা খুব মারধোর করেছে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। বলতে পারেনি বলেই তো…

কথার ওপর মুজফর বলল, বেন্দা হারামীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ও তো মুগিচোর! ছাড়ো! আমার কাছে এসে বসো। আগুনে হাত সেঁকি। খুব ভিজেছি মাঠে আসতে আসতে।

বলে মুজফর টর্চটা জ্বেলে হরিমতীর ওপর ধরে রাখল। হরিমতী থরথর করে কেঁপে দেয়ালে শেঁটে গেছে। কিংকরের আমলে মুজফর আসাযাওয়া করত বটে, কখনও কুকথা বলে নি। কিংকরের সঙ্গে গাঁজার ছিলিম টানত এবং খোঁজখবর নিয়ে বা দিয়ে যেত। কিংকর মাধুকরীতে যেত এ-গাঁ সে-গাঁ। যেখানে-সেখানে মুজফরের স্যাঙাত আছে, তাদের খবর আনত এবং মুজফরের খবর পৌঁছে দিত। কিছু

হাত-লবকা পেত কিংকর বোরেগী। শেষে পুলিশের নজরে পড়ে ও লাইন ছাড়ে। সে-বছরই বানের জলে পা হড়কে ভেসে না গেলে কিংকরকে মুজফরের চাকু খেতে হত।

হরিমতীর দিকে হাত বাড়িয়ে মুজফর বলল, অমন কেন করছ বোষ্টুমী। তুমি তো সতীলক্ষ্মী নও—কারুর মন্তর পড়া বউও নও। এস।

হরিমতী ফ্যাঁচ করে কেঁদে বলল, না। আমি বেবুশ্যে। তারপর কাঁধে মুজফরের থাবা পড়লে সে সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে পা দুটোকে আঁকসি লাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ও বেন্দা। বেন্দা রে।

রাগের চোটে মুজফর চড় মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আটকানো দরজা হড়াম করে উঠল এবং বাইরে থেকে শেকল খোলার ঝনঝন শব্দও হল। তারপর বেন্দার গলা শোনা গেল—থাম্ শালা। বাঁকুদাকে ডাকি।

বলেই বৃষ্টির মধ্যে বেন্দা উঠোনে নেমে চিলচেঁচানি চেঁচাতে শুরু করেছে—বাঁকুদা হে—এ—এ—এ। বাঁকুদা—আ—আ—আ।

চৌকিদারির বাড়ি 'জোল' বা নিচু জমিগুলোর ওধারে। শুনতে পাবে কি না, ঠিক নেই। তবু বেন্দা চেঁচাতে-চেঁচাতে গলা ভেঙে ফেলছিল। এককোচড় আম কুড়িয়েছে। দুটো নারকেলও পেয়েছে! বৃষ্টিতে শেয়ালভেজা হয়েছে ততক্ষণে। নারকেলদুটো এবং আমগুলো দাওয়ায় পড়ে গেছে। দাওয়ায় উঠেই মুজফরের গলা শুনে কাঠ হয়ে দরজায় কান পেতে ভাবছিল, কী করবে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারেনি। মরীয়া হয়ে গেছে।

ভেতরে মুজফর হতভম্ব। তারপর সামলে নিয়ে বলল, দেখ বোষ্টুমী। আমিতো মরেই আছি—কিন্তু তোমার জানটা যাবে। শিগগির তোমার ঢ্যামনা নেড়ি কুত্তাটাকে ডেকে বলো, দরজার শেকল খুলে দিক। নৈলে…

হরিমতী রাতকানা। কিন্তু পাঁজরে ছোরার ডগা টের পেয়ে সে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বেন্দাকে ডাকতে লাগল।—অ বেন্দা শেকল খুলে

দে, নৈলে আমাকে খুন করে ফেলবে। তোর পায়ে পড়ি বেন্দা, কথা শোন্।

বাঁকা চৌকিদার গাঁজা খেয়ে ঘুমোচ্ছে এমন রাতে। বেন্দা জেনেও চেঁচাচ্ছিল। তাছাড়া মুজফরকে বাঁকা কত ভয় পায়, তা সে জানে। বাঁকার সাধ্য নেই মুজফরকে আটকায়। তবু এই চেঁচামেচিতে সাহস পাওয়া যায়। এখন হরিমতীর আর্তনাদ শুনে সাহসটুকু চলে গেল। শেকল খুলবে কোন সাহসে? লোকটা ভয়ংকর বাঘ। শেকল খুললেই তো তাকে এক কথায় রক্তারক্তি করে ফেলবে। বেন্দা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হরিমতী আবার ডাকতে লাগল কেঁদেকেটে। ছোরার ডগা তার পাঁজরে চেপে রেখেছে। জায়গাটা চিনচিন করছে। শেষে গোঙাতে গোঙাতে বলল, অ বেন্দা আমাকে চাকু বিঁধিয়ে দিয়েছে রে।

সত্যি সত্যি বেঁধায় নি। খামোকা খুনোখুনি করার পত্তর নয় মুজফর ডাকু। পাঁচটা খুন আর ডাকাতির মামলা ঝুলছে মাথার ওপর। তার ভাবনা, বাঁকা এসে নিশ্চয় শেকলে তালা ঝোলাবে এবং বৃষ্টির মধ্যেই মধুপুর ফাঁড়ির দিকে দৌড়ে যাবে। মুজফরকে ধরতে পারলে মোটা বকশিস।

বেন্দা হরিমতীর গোঙানি শুনে আতংকে কাঠ হয়ে গেছে। গ্রামের বাইরে এই বাবুর বাগানে এমনিতেই কিছু ঘটলে মাথা ভেঙেও কিছু করার নেই। তারওপর এই বৃষ্টি। বৃষ্টিটা এখন একটু কমেছে। বাতাসও থেমে গেছে। মেঘ সরে চাঁদটাও বেরিয়ে এল। হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে গাছপালা ভূতুড়ে হয়ে উঠল। বেন্দা হরিমতীর মৃত্যুযন্ত্রণা শুনতে কান পেতে আছে—কিন্তু হরিমতীর গোঙানিটা গুনগুন কান্নায় মোড় নিয়েছে কেন বুঝতে পারছে না।

তারপর সে মুজফরের ডাক শুনতে পেল, এ্যাই বেন্দা! আছিস? বেন্দা!

বেন্দা দাওয়ায় উঠে নাক ঝেড়ে বলল, কী?

শেকল খুলে দে।

খুলে দিলে তুমি চাকু মারবে!

মুজফর হেসে বলল, না বে শালা ভূত! ছুঁচো মেরে মুজফর হাত গন্ধ করে না। পয়সা দেব শেকল খুলে দে!

পুরনো আমলের দরজা ভীষণ শক্ত। লাথি মেরে ভাঙা অসম্ভব। ঘরের দেয়ালও খুব উঁচু। চাল ফুঁড়ে বেরুতে হলে দেয়ালে উঠতে হয়। টর্চ জেলে মুজফর দেখে নিচ্ছিল সব। চাকুটা তেমনি করে ঠেকিয়ে রেখেছিল হরিমতীর পাঁজরে। হরিমতী গুনগুন করছে গলার ভেতর। ধমকে বলল, থাম্ মাগী! জবাই করব।

হরিমতী চুপ করল। বাইরে থেকে বেন্দা বলল, বোষ্টুমী! দরজা খুলব?

হরিমতী অশ্লীল গাল দিয়ে বসল এবার। খোল্ না মা-মেগে হতচ্ছারা!

শেকল খুলেই বেন্দা ছিটকে উঠোনে পড়ল। তারপর এক দৌড়ে পাচিল ডিঙিয়ে ওপারে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

মুজফর দরজা খুলে টর্চের আলোয় বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, ভেগেছে রাণ্ডীর বাচ্চা!

তারপর সে জুতো পরে দাওয়ায় গেল। চাঁদের আলোটা মেঘে ঢেকে গেছে এখন। বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। চারপাশে গাছপালা থেকে জল পড়ার টপটপ শব্দ। আর অনেকদিন পরে বৃষ্টির জল পেয়ে পোকামাকড়গুলো আনন্দে গলা ছেড়েছে। গাঁ গাঁ করে ব্যাঙ ডাকছে। রাতের স্তব্ধতাটা আর নেই। চারদিকে ওইসব শব্দ।

মুজফর ঘুরে টর্চের আলো হরিমতীর মুখে ফেলে বলল, ঢঙ দেখালে বোষ্টুমী। না হয় টাকাই দিতুম দশ-বিশটা! মোছলমান বলে ঘেন্না হল, তাই না?

তারপর উঠোনে সাবধানে হেঁটে আগড় ঠেলে বেরিয়ে গেল।

হরিমতী চুপ করে রইল। এতক্ষণে সে ভাবছে, কুস্বপ্ন দেখছিল নাকি।

বেন্দা আগাছার ভেতর থেকে মুজফরের চলে যাওয়া দেখছিল।

প্যাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদ। কাকজ্যোৎস্নায় এবং রাতবিরেতে বেন্দার দৃষ্টি ভাল লেগে—সে দেখল, মুজফর ডাকু পেণ্টুল আর শার্ট পরে আছে। পেণ্টুলের পা গোটানো হাঁটু অব্দি। পায়ে জুতোও আছে। কাঁধে একটা কিট ব্যাগ ঝুলছে। তবে এই বেশে অনেক বার মাঠে ঘাটে বিলে বা নদীর ধারে মুজফরকে দেখেছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় 'বলক' অফিসের 'নেয়পেস্ট্রের' বাবু, ছাগল পালানীদের সমিতিতে যিনি আসেন। অর্থাৎ কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। তেমনি গোঁফ, তেমনি বাবুর মতো চেহারা। ওর বাবা গফুর দর্জি মধুপুর বাজারে বুড়ো হয়ে মরে গোরে গেছে। কে জানত, গফুরের ছেলে ডাকু হবে? যেমন তেমন ডাকু নয়, হিন্দি সিনেমার গব্বর খাঁ। বেন্দা গব্বর খাঁ কে দেখেছিল। তাই মুজফরকে এত ভয়।

বেন্দা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকল। তারপর দাওয়ায় উঠে আস্তে ডাকল, বোষ্টমী!

হরিমতী বলল, থাম্ মুখ পোড়া বাঁদর। আর একটু হলে এই খানে চাকু ঢুকিয়ে দিত।

বেন্দা খিকখিক করে হাসল। দাঁড়াও, লম্প জ্বেলে দেখি। একগাদা আম কুড়িয়েছি—হুটো নারকেল। কোথায় সব পড়ে আছে।

সে ঘরে ঢুকে চৌকাঠের পাশে দেশলাই খুঁজে নিয়ে লম্প জ্বালল। তখন হরিমতী বলল, দ্যাখ্ তো, রক্ত বেরুচ্ছে নাকি? চিটচিট্ করছে কেন?

বেন্দা লম্পের আলোয় পাঁজরে হাত বুলিয়ে বলল, নাঃ। ভয় দেখাচ্ছিল।

হরিমতী হঠাৎ কেঁদে ফেলল। আমার জাত মারতে চাইছিল রে বেন্দা!

বেন্দা লম্প রেখে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আহা! মারে নি তো। চুপ করো দিকিনি! দরজা খুলে না

রাখলে তো এমন হত না। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। যাক্ গে কেঁদোনা। বাঁকুদাকে সকালে কথাটা বলতে হবে।

হরিমতী দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে তবু বাচ্চা মেয়ের মতো হু হু করে কাঁদতে লাগল। বেন্দা অবাক। ——

বালিকা বধূ

মধুপুর ফাঁড়ির সেপাই উপেন্দ্রের আবার ডিউটি পড়েছে বিল বাড়িতে। সঙ্গে এবার জগদীশ নয়, পাঁড়েজী—দাতারাম পাঁড়ে। পেল্লায় চেহারা এবং গোঁফ। কিন্তু লোকটি অমায়িক।

রোদের ডিউটি। রাত্রিযাপন করতে হবে বিলবাড়িতে। ছিচকে চুরি চামারি চিরকাল হয়ে এসেছে গ্রামে। একসময় তা নিয়ে কেউ ফাঁড়িতে বা মহকুমা শহরের থানায় দৌড়ুত না পঞ্চায়েতই ছিল তা সব কেসের বিচার কর্তা। পুরনো ছিচকে দাগী (পুলিশের খাতার নয়, পঞ্চায়েতের) নকুল বাগদী আর মদন বাউরি বুড়ো হয়েছে। নতুন পিঁচকে বাগদী বলতে অনেক গুলো গজিয়েছে। পুকুরের মাছ চুরি, হাঁস, মুরগী, চুরি, মাঠ বা খামার থেকে শীষধান চুরি—কিংবা শরত কালে খালে ডোবায় পচতে দেওয়া পাট ও প্রতি রাতে কয়েক গোছা করে তুলে নিয়ে যায় চোর এবং দূরের বিলে মনের সুখে কেচে আশ বের করে। তবে সিঁদেল চোরের সংখ্যা কমেছে। বিল বাড়ির আগের দিনে পঞ্চায়েত সন্দেহ ভাজন চোর কে নানা রকম শাস্তি দিত। জুতোর মালা, মাথা ন্যাড়া, জুতোর প্রহার ইত্যাদি। বেশী বাড় বাড়লে ফাঁড়িতে নাম যেত। পুলিশও ওত পেতে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠেঙাত। কিন্তু ইদানিং হাওয়া উল্টোপাল্টা। বাগদী পাড়া, কুনাই পাড়া, বাউরী পাড়ায় রাজনীতি ঢুকেছে। ঝাণ্ডা উড়েছে। নতুন চোরদের গায়ে হাত পড়লে পঞ্চায়েতে ঝগড়া বেধে যাচ্ছে। পুলিশে নাম গেলেও কিছু হচ্ছে না। তবে বেন্দার ব্যাপারটা আলাদা।

বেন্দা কমলাক্ষের ঝিয়ের বোন পো এবং তার বাড়িতেই মানুষ। তাকে পুলিশ খামোকা নিয়ে গিয়ে ঠেঙালে মাথাব্যথা না হওয়া উচিত কমলাক্ষের। হয় নি। বেন্দাকে নিয়ে তার জাত ভাইদের ওকোনো মাথাব্যথা নেই বরাবর। বেচা করুর সঙ্গে কোনো দিন নেই। মিটিঙে নেই। মিছিলে নেই। ডাকলে যাচ্ছি বলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব বিল বাড়িতে নেই বললেই চলে। সে এ গাঁয়ে সৃষ্টি ছাড়া জীব।

উপেন্দ্র আর পাঁড়েজী সূর্যাস্ত-কালে যখন গাঁয়ে আসছে, বিন্দে তখন 'ছেলে পোঁতা' নামে একটা খালের তলায় পাঁকজল হাতড়ে মাছ ধরছে। পাঁকে ভূত হয়েছে সে। উপেন্দ্র চিনতে পারত না। বেন্দা ভূত সাদা দাঁত বের করে হাসতেই চিনে ফেলল! উপেন্দ্র গোঁফ পাকিয়ে বলল, তুই সেই বিনোদ না?

বেন্দা বলল, হ্যাঁ সেপাই দা!

দাঁত বের করছিস যে?

বেন্দা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আজ্ঞে একটা খবর ছিল। বাঁকুদাকে দিয়ে ছিলুম। বলেনি ফাঁড়িতে?

উপেন্দ্র জানে না। সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী খবর ছিল রে?

আজ্ঞে মুজফর ডাকুর। না মারেন তো কাছে গিয়ে বলব।

বেন্দা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টে উপেন্দ্রের ভাবগতিক বুঝতে চেষ্টা করছিল। পাড়েজী উদাস হয়ে উঁচু বাঁধ থেকে প্রকৃতি দেখছে। নরম বাতাসে তার কাঁচাপাকা গোঁফ ফুরফুর কাঁপছে। উপেন্দ্র বেন্দার ভয় দেখে আমোদ পাচ্ছিল। ইশারায় এবং ছু ছু করে কুকুর ডাকার মতো কাছে ডাকল।

বেন্দা বলল, ঝড়জলের রাতে মুজফর ডাকু হরিমতী বোষ্টুমীর ঘরে ঢুকেছিল সেপ্পাইদা। চাকু মারতে যাচ্ছিল। আমি খুব চেঁচিয়ে চৌকিদারকে ডাকতেই মুজফর পালিয়ে গেল।

উপেন্দ্র মিটিমিটি হেসে বলল, তুই বাপ্পোত বোষ্টুমীর কোলে দুধু খাচ্ছিলি বুঝি?

লজ্জা পেয়ে বেন্দা মুখ ঘোরাল। বলল, আজ্ঞে না, না। উ কী কথা ?

তার পেটে বেটনের মৃদু গুতো দিয়ে উপেন্দ্র বলল, সত্যি বল।

বেন্দা একটু তফাতে সরে গিয়ে লাজুক হেসে বলল, আজ্ কাল বোষ্টুমীর কাছে থাকি। মাসি আমার সামনে থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়েছিল। কি করি বলুন সেপাইদা ? একটা জায়গা—থল তো চাই মানুষের।

উপেন্দ্র গলা চেপে বলল, বোষ্টুমীর পাশে শুস্ তো ?

যান্! আপনার খালি আবোল তাবোল কথা। —বলে বেন্দাবন আবার খালে নেমে গেল।

উপেন্দ্র হাসতে হাসতে চলে গেল। পাঁড়েজী তেমনি চোখে প্রকৃতি দেখতে দেখতে তার পেছন পেছন এগোল। বেন্দা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মুজ্ফরের কথাটা গ্রাহ্যই করল না। এ তো ভারি অবাক কাণ্ড।

রোদে ফাঁড়ির সেপাইরা আসবে বাঁকা চৌকিদার জানে। উঠোনে সতরঞ্চি বিছিয়ে আপ্যায়নের চূড়ান্ত করে। আইনরক্ষকদ্বয় বসলে তাড়ি ভাঁড় আনল বাঁকা। তারপর বউয়েব উদ্দেশ্যে বলল, হা করে দেখছ কী ? গেলাস গুলান দাও শিগগিরি।

বাঁকার এটি তৃতীয় বউ। প্রথম বউ বাচ্চা হতে মারা পড়েছিল। দ্বিতীয় বউ এক বাস ড্রাইভারের সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। তৃতীয়টি তিন কুড়ি নগদ টাকায় খরিদ বালিকা অবস্থায়। এই এক বছরেই ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে। বাঁকার মিতের নামও বাঁকা—সে হল বাউরি বাঁকা। হাইওয়েতে রোডস দফতরের গ্যাংম্যান। বাঁকা বাউরীর মতে, মিতে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে খাচ্ছে। আসলে মেয়েরা দ্রুত স্বামীর বয়সের সঙ্গ ধরে ফেলে। উপায় থাকে না বলেই।

বউয়ের নাম ভানুমতীই হবে ? বাঁকা অনুমান করে। কারণ তার মামা শ্বশুর শাশুড়ী ভানু বলে ডাকে। পুরো নাম শুধোবার গরজ ছিল

না। নামে কী আসে যায়? ভানু অনেকটা ঘোমটা টেনে ছুটো কাচের গেলাস, একটা এনামেলের গেলাস আর পেতলের সরাতে নুন পেঁয়াজ তেল লংকার ঝাঝাল চাল কলাই ভাজা রেখে চলে গেল। তারপর লম্প জ্বেলে দাওয়ার খুটির কাছে রাখল এবং চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে রইল।

পাঁড়েজীর চোখ সারাক্ষণ ঘোমটার দিকে এবং সুযোগ পেলেই চোরা চাউনিতে একঝিলিক হাসি ছুড়ে মারছে। উপেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে বিরক্ত। বাঁকা বকবক করছে আর ছিলিম টানার ভংগিতে সিগারেট টানছে। বৃষ্টির জল, মাঠের অবস্থা, বানবন্যার বিপদ নিয়ে কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘন হল। আকাশ পরিষ্কার। হালকা হাওয়া এসে বাড়ি ঢুকছে মাঠের দিক থেকে। উঁচু ভিটের ওপর বাড়ির ওপর গাছগাছালি ঝুঁকে আছে। সে-রাতের বৃষ্টির গন্ধ মাটির গা থেকে মুছে যায়নি বলে পোকামাকড়, ব্যাঙ, সোনাগদি এবং তক্ষক ডাকতে শুরু করেছে।

ঘড়ি দেখে উপেন্দ্র বলল, বাবুদের একবার দেখা দিয়ে আসি। ওঠ পাঁড়েজী!

পাঁড়েজীর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রোঁদে এসে গাঁয়ের বাবুদের দেখা করার নিয়ম আছে। তাছাড়া বাঁকার বাড়ি রাত কাটানো নিয়ে বাবুরাই কথা তুলবেন ওপরওলাদের কানে। আজকাল হাওয়া অন্যরকম।

তবে কমলাক্ষবাবু কিংবা সুখেনবাবুর বাড়ি গেলে রাতের খাওয়াটাও জুটে যাবে—বাড়তি খাওয়া। আসার আগে উপেন্দ্র গিলেছে একটা পাঁউরুটি আর গোটাকতক রসগোল্লা। পাঁড়েজী বুদ্ধি করে চাপাটি সেঁকে খেয়ে নিয়েছে। ফাঁড়িতে বরাবর বড্ড ঝগড়াঝাঁটি। মেস করা যায়নি। যে-যারটা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়। এ এস আইয়ের অবশ্য ফ্যামিলি আছে। নতুন বউ এবং সুখের সংসার। উপেন্দ্রেরও নতুন বউ। কিন্তু পড়ে আছে বিরহিনীর মধ্যে সেই ধুধুলিয়ায়। থানায় বদলি হতে পারলে কাছে এনে রাখবে।

পাঁড়েজী নাকি ব্যাচেলার। কেউ বিশ্বাস করে না। অনিচ্ছাসত্বেই উঠল আড়ামোড়া দিয়ে। এক হাঁড়ি তালরসে তিনটে সোমত্ত পুরুষের পা টলে না। তবু টলাতে ইচ্ছে করে। বাঁকা বলল, চলুন আপনারা। আমি যাচ্ছি।

যাবার আগে পাঁড়েজী ভানুর দিকে সেই চোরা ঝিলিক ছুড়ে গেল।

আইনরক্ষকরা চলে গেলে ভানু উঠোনের আসর থেকে এঁটো গেলাস আর হাঁড়িটা নিয়ে গিয়ে উঠোনের কোণায় ধোয়াপাখলার জায়গায় রাখল। তারপর চাপা স্বরে দুর্বোধ্য কীসব বলতে বলতে দাওয়ার কোণায় রান্নাশালে গেল। মাটির ঢাকনের তলা থেকে কয়েকটা রুটি বের করল। বাঁকাট্যারা ছোট্ট এনামেলের হাঁড়িতে ল্যাটামাছের ঝোলে চুবিয়ে খেতে থাকল। বাঁকা উঠোনের শতরঞ্চিতে চিত হয়ে নক্ষত্র দেখছে। নেশা কমেনি। তবে রাতের বেলা আজকাল সে কিছু খায় না। অম্বল হয়ে যায়। বিকেলেই দুমুঠো মুড়ি কিংবা একটুকরো পাঁউরুটি খেয়ে নেয়। মাঝেমাঝে সখ করে চা বানিয়েও খায়। বিঘেদেড়েক চাকরান জমি আছে পূর্বপুরুষের। তার ওপর চৌকীদারী যৎকিঞ্চিৎ মাইনে। তার জীবন মোটামুটি চলে যাওয়ার মত—একটি বউসহ।

বাঁকা বলল, সিথান (বালিশ) দাও। এখানেই শুই। আর শোনো, কুলুপ আটতে ভুলে যেও না। তোমার ওই স্বভাব।

ভানু আস্তে বলল, বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকবে না।

খিকখিক করে হাসল বাঁকা চৌকিদার। —তাই তো ঢোকে। বেন্দা ছোক ছোক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁদরকে বিশ্বাস নেই। সম্পর্কে ভাই হলে কী হবে? তারওপর ওই মাগীর সঙ্গে জুটেছে।

ভানু বলল, বোষ্টুমীকাকী চাল ধার করতে এসেছিল।

দিয়েছ নাকি?

দিয়েছি। আমার কোমরের ব্যথাটা কমিয়ে দিলে। কত ওষুধ তো খেলুম।

রোজ এইসব কথাবার্তা হয়ে থাকে এসময়। পাশাপাশি শুয়েও চলতে থাকে। বয়স্ক লোকটা যখন বুড়ো বাঘের মতো ভানুর কাঁচা শরীরের মাংস কামড়ে-কামড়ে খেতে থাকে; তখনও ভানু চাপা স্বরে তার সংসারের কথা বলতে থাকে। বাঁকা বোঝে, তার সংসার খুব মনে ধরেছে নতুন বউটার। প্রথম এসেই যেরকম কোমরে আঁচল জড়িয়ে গেরস্থালি সামলাতে শুরু করেছিল, দেখে তাক লেগে যেত। বাঁকার উঠোন, দাওয়া, ঘরের মেঝে আজকাল তকতকে হয়ে থাকে। দেয়ালে গিরিমাটি গোলা বড় বড় বৃত্তের মধ্যে খড়িগোলা সাদারঙের পাখি, পদ্মফুল, কালীমায়ের চরণ আঁকা। ধান উঠতে শুরু করলে আবার নতুন করে সাজাবে বলে রেখেছে। বউটা কার্তিকের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু হেসে বলে, আমার বাবারও তুপাঁচকাঠা ছিল। পেটের জ্বালায় বেচে খেয়েছিল, তাই।

দরজায় কুলুপ এটে দুটো বালিশ আর খেজুরতালাই এনে বলল, সতরঞ্জি-টঞ্জি হটাও।

ক্যানে, ক্যানে?

ওতে শোব না। ওঠ।

বাঁকা সরে গিয়ে বলল, মানুষকে ছি-ঘেন্না করতে নেই।

ভানু ঝাঁঝাল করে বলল, মানুষ নাকি?

চুপ, চুপ।

বিছানা করে লম্প ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে ভানু পেটের কাপড় ঢিল করতে করতে বলল, ওই নতুন সেপাইটা ভাল না। আর কখনো ওকে বাড়ির ভেতর ডেকো না।

বাঁকা হাসতে লাগল।

সেদিনকার মতো মুর্গির ঝোল খাওয়াবে নাকি?

আহা সে তো নিজের পয়সায় খেয়েছিল।

নিজের পয়সায়? আমি শুনিনি কিছু? —একটু চুপ করে থাকার পর আবার বলল ভানুমতী, কাল আমি সৈরভীদিদের সঙ্গে

দোহালিয়া বিলে যাব। বারণ করতে পারবে না। খুব শুশনি শাক হয়েছে। অনেকদিন শুশনি পাতা খাইনি।

বাঁকার মন তার শরীরের দিকে। বুকে নাক গুজে বলল, সাবুন মেখেছ নাকি? সুন্দর গন্ধটা তো।

মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভানুমতী বলল, তোমার মুখে ভকভক করে তাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে। সরে শোও

বাঁকা নিস্তেজ হয়ে গেল হঠাৎ। চিৎ হয়ে শুয়ে নক্ষত্র দেখতে দেখতে বলল, আচ্ছা! তোমার পেটেকোলে কিছু আসছে না ক্যানে বলোদিকিনি?

হ্যাঁ। আমি বাঁজা যে! ভানু রাগ করে বলল। তারপর গলার ভেতর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, মুরোদ আছে মরদের?

আচমকা তালপাতার বেড়ার দিক থেকে টর্চের আলো এসে দুজনের ওপর পড়েই নিভে গেল। ভানু ছিটকে সরে উঠে বসেছিল। গায়ে কাপড় জড়াতে থাকল। বাঁকা ধুড়মুড় করে উঠে বলল, কোন শালারে?

উপেন্দ্রের গলা শোনা গেল। —ধুর বাঞ্চোত! তোমরা উঠোনে পড়ে আছ কে জানে!

অ। বাঁকা বিরক্ত হয়ে বলল। তা আগে একটুকুন সাড়াশব্দ দেবেন তো!

আগড়হীন বাড়ির ভেতর আইনরক্ষকদ্বয় বুটের শব্দ করে ঢুকে পড়ল। পাঁড়েজী হাসতে হাসতে বলল, এখেনে শুত্ করছ কেনো? বিষ্টি হবে তো ভিজে যাবে।

ভানুমতী তখন দাওয়ায় চলে গেছে। উপেন্দ্র বলল, অন্যায় হয়ে গেছে বাঁকা। কিছু মনে করো না।

বাঁকা বলল, বাবুদের সঙ্গে দেখা হল?

কমলবাবুর হল। উপেন্দ্র বলল। সুখেনবাবু কলকাতা গেছে।

উদ্বিগ্ন বাঁকা বলল, শোবার জায়গা?

কমলবাবুর বারান্দায় শোব। আবার কোথা? সে তোমাকে

ভাবতে হবে না। —বলে উপেন্দ্র ওদের খেজুর তালাইয়ে বসে পড়ল। পাঁড়েজীও বসল।

বাঁকার চৌকিদারীজীবনে এসব ঝামেলা কিছু নয়। চৌকিদার সবার চাকর। গাঁয়ের পঞ্চায়েত বাবু হোক, কিংবা সরকারী লোক— সবাই তাকে হুকুম করে। পালন না করে পার নেই। সমবায় সমিতির ঋণ আদায়ের দিনও তাকে নীল উর্দি পরে হাজির থাকতে হয়। গাঁয়ে সরকারী লোক যেই আসে, সেই প্রথমে বলে, চৌকিদার কোথা? আর আইনরক্ষকরা এলে তো কথাই নেই। না-খাওয়া না-নাওয়া বাঁকাকে পেছন-পেছন ঘুরতে হবে। কখনও সারারাত জেগে কাটাতে হবে।

এই একবছরে ভানুমতীর ঠাওর হচ্ছে, চৌকিদারের বউ বলে তার সব গর্বের দালানবাড়িটা যেন বালির ওপর বানানো। তার আধবুড়ো বর চৌকিদারকে সে ভাবত রাজার লোক—রাজপ্রতিনিধি। তার মামা-মামী বলেছিল, আমাদের ভানুর বর 'সরকারী লোক'। ভানু ঘর করতে এসে সেই দাপটে ঘুরেছে পাড়ায়। এখনও ঘোরে না, তা নয়। ঝগড়া হলে শাসিয়ে বলে, থামো। দেখাচ্ছি মজা। চৌকিদার আসুক।

বিলে মাছ ধরতে গিয়ে ইজারাদার তাড়া করেছিল। তখনও তাকে শাসিয়েছিল ভানু—আমি কে জানো? কার গায়ে হাত দিতে আসছ জানো? আমি চৌকিদারের বউ।

ইজারাদার বেজায় হেসে বলেছিল, আরে যা যা!

এখন সারাবছর এসব কাণ্ড দেখে ভানুর মোহ ভেঙে যাচ্ছে। দাওয়ায় অন্ধকারে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রুষ্ট সাপিনীর মতো ফণা তুলে রয়েছে। সুযোগ পেলেই যেন ছোবল দেবে। ভারি তো পুলিশ! পুলিশ বলে মাথা কিনে নিয়েছে। রাতবিরেতে একটু শান্তিতে শুতেও দেবে না!—

উপেন্দ্র বলল, পাঁড়েজীর গলা ভেজেনি। তখন থেকে উসখুস করছে। একবার বাউরিপাড়ায় দেখ না, বোতলটাক চোলাই পাও

নাকি। ফাঁড়ির লোক শুনলে কবুল করবে না। তুমি অন্য কিছু বলো যাও দিকি দাদা আমার।

বলে সে টর্চ জ্বেলে একটা পাঁচটাকার নোট ধরিয়ে দিল বাঁকাকে। অনিচ্ছায় বাঁকা উঠল। পদো বাউরি চোলাই করে। আবগারির হামলাতাও হয় মাঝেমাঝে। কিন্তু কে খবর দিয়ে আসে, চৌকিদার হয়েও বাঁকা জানে না।

বাঁকা বলল, আমার টর্চবাতিতে বেটারি ফুরিয়েছে। সুখেনবাবুকে বলেছি। কবে দেবে কে জানে। বরঞ্চ আপনার টর্চবাতিটা দিন। আজকাল পোকামাকড় বেরুনোর সময় রাস্তাঘাটে।

উপেন্দ্র টর্চ দিলে সে বউকে বলল, তুমি আর জেগো না। ঘরের ভেতর শুয়ে পড়ো।

ভানু বলল, শোব তোমার মাথায়? তালাইটা দিয়ে যাও।

উপেন্দ্র ও পাঁড়েজী সশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, যেন খুব অন্যায় হয়ে গেছে। বাঁকা শতরঞ্চিটা এনে পেতে দিল আগের মতো। তালাই ও বালিশতুটো বউকে দিল। তারপর বেরিয়ে গেল।

ভানু ঝটপট অন্ধকারেই তালা খুলে ঘরে ঢুকল এবং মেঝেয় বিছানা করতে থাকল। ঘরের ভেতর গরম বড্ড। মনে মনে আইনরক্ষকদের শাপ-শাপান্ত করতে-করতে সে দরজা আটকাচ্ছে, সেই সময় উপেন্দ্র উঠে এল। ফিসফিস করে বলল, এই! শোনো। এই টাকা দশটা রাখো তো।

পাঁড়েজী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দরজা খুলে কান পেতে আছে।

ভানু চমকে উঠেছিল। বলল, কিসের টাকা!

তোমাকে আমরা দিচ্ছি। আহা, নাও না! চৌকিদারের আসতে দেরি হবে।

ভানু হিসহিস করে বলল, না।

আহা, লজ্জার কী আছে? নাও

না। সরুন দরজা দিই।

চণ্ড করো না। পরে আর দশটা নিও

ভানু বলল, কুকথা বললে চেঁচিয়ে লোক ডাকবো। সরুন।

উপেন্দ্র বলল, জানো? তোমাকে এক্ষুনি এ্যারেস্ট করে ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে পারি? তোমার কোনো বাপও বাঁচাতে পারবে না। যা বলছি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো শোনো।

উঠোন থেকে পাঁড়েজী বলল, আরে লো না। এক রাত্র বন্ধু হোবে তো কী হোবে? দো মিনিটের কারবার!

উপেন্দ্রের মুখের ওপর কপাটদুটো জোড়া হয়ে গেল। খিল পড়ল। মুখ বাঁচাতে সরে এসেছিল উপেন্দ্র। দুমিনিট গুম হয়ে ঘামতে ঘামতে সে অস্থির। তারপর বলল, শোনো। চৌকিদারের কানে তুললে কিন্তু বিপদে পড়বে। তোমাদের দুজনকেই ধরে নিয়ে উল্টো করে ঝোলাব।

তারপর সে উঠোনে নেমে গলা চড়িয়ে বলল, এ শালা চৌকিদার কবে বিপদে পড়বে, বুঝলে পাঁড়েজী? মুজফর ডাকুর সঙ্গে শালার লেনদেন আছে।

পাঁড়েজী সায় দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ।

দুই আইনরক্ষক সিগারেট টানতে থাকল গুম হয়ে। ওপরে দৃষ্টি নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। মেয়েটাকে বুঝতে তাহলে বেজায় ভুল হয়ে গেছে। এমন তো হবার কথা না। নাকি পাঁড়েজীকে দেখে ঘাবড়ে গেছে বালিকাবধূ?

কিছুক্ষণ পরে চৌকিদার ফিরে এসে বলল, হল না। বললে, এক ফোঁটা মাল নেই। করবে কী দিয়ে? খরার মাসে আকাড়া চলছে। চাল গুড়-টুড় পাবে কোথা? কথা মিথ্যা নয় সেপাইজী। বাউরিপাড়ায় খুব ভাতের কষ্ট।

টাকা ফেরত নিয়ে উপেন্দ্র বলল, তুমিই শালা মহা ত্যাঁদোড় হয়েছ। একটুকু মাল যোগাড় করতে পারলে না! তুমি কোন ঘাটের জল খাচ্ছ, তাও জানি। সময় হলে টের পাবে। এস পাঁড়েজী।

দুজনে জুতোর প্রচণ্ড শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। বাঁকা হতভম্ব। একটু পরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, কই গো! খোলো!

ভেতর থেকে ভানুমতী বলল, স্যাঙ্গাতদের সঙ্গে যাও না। আজ আর শুতে হবে না!

আহা! কী করব? ওনারা আমার ওপরওলা।

চৌকিদারী ছেড়ে দাও। ...ভানুমতী দরজা খুলে বলল। নৈলে আমি বাড়ি ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায়, পালিয়ে যাব।

ঘরের গরমে সেদ্ধ হয়েছে। তাই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। বাঁকা ভাবল। বলল, বরঞ্চ দাওয়াতেই বিছানা করো। আবার না এলে বাঁচি!

বাবুর বাগানে বৃষ্টি

হরিমতী কুলোয় গমের কুটো বাছতে বাছতে বেন্দার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টে চেয়ে বলল, তোর সব ভাল বেন্দা—খালি চোট্টামিটুকুন যদি ছাড়তিস।

বেন্দা বাগানজুড়ে শশার বীজ, লাউয়ের বীজ, বেগুনচারা পুঁতেছে। বৃষ্টির জলে বাবুর বাগানের মাটি হয়েছে নরম। বলেছে, দেখো মা বোষ্টুমী, তোমার বাড়ির ভোল বদলে দেব। কোত্থেকে কার কাছে বীজ নিয়ে আসে, ভেবে পায় না হরিমতী। দুটোমাস বেন্দা গায়ে ঘাম ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। কাল গেছে জষ্ঠিসংক্রান্তি। মধুপুরে মনসার নামে মেলা বসেছিল। অনেক রাতে বেন্দা ভিজতে-ভিজতে একটা চকচকে নতুন হেরিকেন নিয়ে ফিরেছিল। সেই সঙ্গে কোঁচড় ভর্তি জিলিপি।

জবাগাছের একটা চারা পুঁতছে এখন। বলল, তুমি খালি চোট্টামিই দেখ। সেই রেতের বেলা থেকে চোট্টামি-চোট্টামি করছ। অমন করলে মাইরি আমার পোষাবে না।

সে সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে হরিমতী মিষ্টি হাসল। ...আহা, রাগ করিস কেন? কাছে আয়, পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে দিই।

বেন্দা রাগ করে বলল, তুমি যে একটা হাঁস মেরে এনেছিলে। সেটা চুরি না? আমি চোর, আর তুমি সাধু!

হরিমতী হাসতে হাসতে বলল, সে তো জেবনে ওই একবার। তুই বিশ্বাস কর বেন্দা! কেউ বলতে পারবে না, হরিমতী কারুর জিনিসে ভুলেও হাত দিয়েছে। হ্যাঁ—হাঁস মেরে এনেছিলুম বটে। সেটা ঝোঁকের মাথায়। তুই মাংসের ঝোল খেতে চাইলি, তাই। কিন্তু এখনও মনটা বড় ধুকুপুকু করে রে।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে ফের বলল, তাই বলে আর নয়। তুই মাথা ভাঙলেও নয়।

বেন্দা খুরপিটা জোরে মাটিতে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ওরে আমার! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর?

হরিমতী মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

বেন্দা সামনে এসে বলল, এই দুটো মাস মুনিশ খেটে গতর কালি করে তোমাকে খাওয়াচ্ছি বোষ্টুমী। আর তুমি খালি চোর-চোর করছ দুবেলা। কৈ, দাও আমার হেরিকেন।

হেরিকেন নিয়ে কোথা যাবি?

যেথা যাই, তোমার কী? আর তোমার বাড়ী আসব না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

হরিমতী গমের কুলো রেখে উঠে দাঁড়াল. তারপর মিষ্টি হেসে দাওয়া থেকে নেমে ওর হাত ধরে টেনে দাওয়ায় বসি[illegible] [illegible] [illegible]. আহা! রাগ করিস কেন? তোর ভালর জন্যেই তো বলছি।

না। আমার ভাল কাউকে দেখতে হবে না। আমার পোষাবে না। চলে যাব।

গেলে তোকে আটকে রাখতে পারব না বেন্দা।... হরিমতী দুঃখিত স্বরে বলল।......তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? আমার কাছে ভাল না লাগলে চলে যাবি। তবে কথাটা শোন্ সোনামানিক আমার! আমাকে রাতকানা রোগে ধরেছে। দিনেও আজকাল ক্রিমে ক্রিমে সব ঝাপসা দেখছি। শরীরের যা হাল গতিক, রোগ ব্যাধিতে ধরলেই

আর বাঁচব না। তাই বলছি, ভালমতে থাক্। ই বাবুর বাগান আমি তোকেই রেজেস্টরি করে দিয়ে যাব। পাঁচ কাঠা জায়গার দাম কম নয় বেন্দা। আর……

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আর তোকে বলেছিলুম— আমার কিছু গয়নাগাঁটি আছে। সেও তোকে দিয়ে যাব। রাঙা টুকটুকে মেয়ে দেখে বে করবি। তাকে পরিয়ে দিবি।

এবার বেন্দা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। বলল, এমন করে বলছ যে এক্ষুনি মরতে বসেছ। তোমার মরার আগে আমিই না মরি বোষ্টুমী। আয়নাখানা নিয়ে এসে নিজেকে একবারটি দেখ না কী হয়েছে ?

হরিমতী ভুরু কুঁচকে বলল, কী হয়েছি রে মুখপোড়া বাঁদর ?

বেন্দা বলল, বয়স কমে যেয়েছে তোমার। ইদিকে খেটে-খেটে আমিই বুড়িয়ে যাচ্ছি

কথাটা সত্যি। নিয়মিত তুমুঠো খাদ্য জোটার দরুন হরিমতীর গায়ে মাংস লেগেছে। গাল ফুলে চেকন হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢেকেছে এবং স্তন তুটিও পূর্ণ যুবতীর মতো আবার ডাগর হয়েছে। সে রুখু চুলে একটু করে গন্ধ তেল ঘষে। গন্ধতেলটা বেন্দা মধুপুর থেকে এনেছিল, চুরিও হতে পারে। চুল আঁচড়ে হরিমতী তার বাগানে দাঁড়ালে লোকের এম হয়, এ বুঝি সেই গোবিন্দের দিনকাল ফিরে এসেছে বাবুর বাগানে। লোকে বলে, বেন্দার যৌবন চুষে ছিবড়ে করে ডাইনি মাগীটা নিজের ভোল ফিরিয়েছে।

বলে বটে ডাইনি মাগী, কাচ্চাবাচ্চার অসুখ বিসুখ হলে তার কাছেই এসে দাঁড়ায় তাদের বউরা। হরিমতীর মা নির্মলা ছিল বদ্যি বুড়ি বিল বাড়িতে। অনেক রকম ঠিকন-ঠাকন ওষুধপত্তর জানত। মাতুলী জলপড়াটা দিত। হরিমতী মায়ের কাছে বিদ্যার অল্পসল্প পেয়েছে বলে লোকের বিশ্বাস।

হরিমতী সুখেনের দাদা হিতেনের রোগা বউটাকে কী ভাবে সারিয়ে তুলল! লোকে অবাক হয়ে যায়। তবে মাঝখান থেকে

হরিমতীর বড় লাভ, তার বাগানবাড়ি রক্ষা পেয়েছে কমলাক্ষের হাত থেকে। সুখেন বলেছে, দাদা! গরীব মেয়েটার সামান্য পাঁচকাঠা জায়গায় আর হাত নাই বা দিলেন? তাছাড়া জায়গাটা তো আইনত হরিমতীর নামেই রেকর্ড হয়েছে। আমি স্বচক্ষে সেই রেকর্ডপরচা দেখেছি।...

মেঘে রোদ ঢেকে গেল এসময়। তারপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি এল। পা তুলে সরে দাওয়ায় দেয়ালের দিকে সরে গেল বেন্দা। হরিমতী বলল, বর্ষা এবারে ভরন্ত হবে। ও বেন্দা, জাল বুনবি বলছিলি যে। নদীতে এবার খুব মাছ হবে, বুঝলি?

বেন্দা আনমনে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, শুনে দেখলে তুমি! কী আমার গুনিন মেয়ে রে!

হরিমতী বলল, আগাম বর্ষা যেবার হয়, সেবার খুব মাছ হয়।

বেন্দা বলল, ওবেলা মধুপুর যাব। দেখি, খানিক লাচি সুতো পাই নাকি। একটা টাকু চাই। মনাকাকাকে ধরব। যো বুনে দেবে।

হরিমতী গমের কুলোটা তুলে দাওয়ার কোণায় উনুনের কাছে নিয়ে গেল। গমগুলো ভেজে ফেলবে শুকনো খোলায়। তারপর সেদ্ধ করবে। দারুণ স্বাদ হবে।

উনুনের পাশে শুকনো কাঠের পাঁজা রয়েছে। খরার দিনে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনে রেখেছে। উনুন জ্বেলে বলল, শলাই কাঠিটা ন্যাকড়ায় বেঁধে রেখেছিলুম। টাটকা হয়ে আছে দেখছিস?

এটা এমন কিছু বলার কথা নয়। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছে করছে বেন্দার সঙ্গে। বৃষ্টিটা ঝমঝমিয়ে উঠেছে। চার দিক ধূসর হয়ে গেল বেন্দা বলল, হুঁ।

কী ভাবছিস বল্ তো অমন করে?

হেরিকেনটা বেচে দেবে।

না। থাক্ আমাদের দরকার নেই বুঝি? একটা লম্প মোটে কেরাচিনের নদী বইছে তোমার ঘরে।

হরিমতী হাসল।...তুই আনবি কেরাচিন মধুপুর বাজার থেকে।

আমি তো চুরি করে আনব।

হরিমতী খোলায় গম দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, আবার ওই কথা? তোর রাগ পড়ছে না দেখছি। নে, দুমুঠো গমভাজা খা গরম গরম।

বেন্দা খুশি হয়ে বলল, আচ্ছা বোষ্টুমী! একটা কথা বলি শোনো।

হরিমতী কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তুই বোষ্টুমী-বোষ্টুমী করিস নে তো। তোকে বলেছি না—কখনো বোষ্টুমী বলবিনে। আমি কি ভেক নিয়েছি, না ফোঁটাতেলক কেটেছি!

বেশ, বেশ। কিন্তু কী বলে ডাকব? বেন্দা খ্যা খ্যা করে হাসল।

কিছু বলে ডাকতে হবে না।

আগে মাসি-টাসি করতুম···বেন্দা দুষ্টুমি করে বলল।

জ্বলন্ত কাঠ বের করে হরিমতী বলল, মারব বেন্দা! তোর কোন জন্মের কোন বাবার মাসি ছিলুম রে?

বেন্দা হাত বাড়িয়ে বলল, কৈ গমভাজা দাও। খেতে খেতে কথাটা বলি।

দুমুঠো ভাজা ভাজা গম একটা মাটির ঢাকনে করে দিল হরিমতী। খেতে খেতে বেন্দা বলল, সুখেন মাস্টারকে জিগ্যেস কোরো না—আবার ওনারা কবে মাটিকাটার কাজ করাবে। বেশ মাইরি অতগুলো করে গম পাচ্ছিলুম। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চলবে কী করে, তাই ভাবছি।

হরিমতী বলল, জিগ্যেস করব।

আর একটা কথা।

হরিমতী তাকালো।

গয়নাগাঁটিগুলো পরো না কেন বলো তো? কোথায় রেখেছ?

হরিমতী হাসল। পাবি, পাবি। তোকেই দিয়ে যাব সব। সুহাসে থাক্ না কাছে। সব পাবি।

আছি তো!···বলে বেন্দা ফ্যাচ করে হাসল। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই যে আছি, লোকে মাইরি বড্ড ঠাট্টা করে। তাই মনে-মনে অনেক-সময় ভাবি....সে থেমে গেল হঠাৎ।

কী ভাবিস?

ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি?

ঢঙ করিস নে। যা বলতে চাস, বল্।

তোমার সিঁথেয় একটুকুন সিঁদুর এনে দেব।...বেন্দা ভুম করে বলে তেমনি হাসতে লাগল।

হরিমতী মুখ ঘুরিয়ে গম ভাজতে থাকল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

বেন্দা ডাকল, বোষ্টুমী!

আবার বোষ্টুমী?

ধুস্ শালা! কী বলব তবে? বেন্দা গোঁ ধরে বলল।

আমি বোষ্টুমীই বলব—তুমি রাগো আর যাই করো! সে বাকি গমভাজাগুলো মুখে পুরে চিবুতে থাকল।

হরিমতী আস্তে বলল, তোর মুখে বোষ্টুমী শুনলে বড্ড পর লাগে বেন্দা। আর তো তুই আমার পর না। তোকে কী দিতে বাকি রেখেছি আর?

ওই দেখ! তোমার মাইরি বড্ড ছিচ্ কাঁদুনে স্বভাব।

বেন্দা, তুই আমাকে এ বয়সে খুব সুখ দিয়েছিস! এত সুখ জেবনকালে পাইনি রে!...হরিমতী সুখের কান্না কাঁদতে কাঁদতে নাক মুছল আঁচলে।

বেন্দা হাই তুলে বলল, পুকুরে ডুব দিয়ে আসি গে। গাময় কাদা লেগে আছে।

তারপর ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। হরিমতী সুখের কান্না থামিয়ে এনামেলের হাঁড়িতে ভাজাগম সেদ্ধ করতে দিল। ঘরে ঢুকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। আয়না নিয়ে দাওয়ায় এসে সরু সরু দাঁতগুলো দেখল। মুখ দেখল। দৃষ্টি সত্যি কি ঝাপসা হয়ে আসছে দিনেদিনে? ভগবান, মুখ তুলে তাকিও অভাগিনীর দিকে। অন্ধ হয়ে গেলে খুব কষ্টে পড়বে হরিমতী। বেন্দাকেও হয়তো

কোনো লোভেও আটকানো যাবে না। বেন্দা চলে গেলে আর বাঁচবে না হরিমতী।

হয়তো বৃষ্টিবাদলার দিনে আলো কম এবং আয়নাটাও পুরনো, তাই এমন একটু-একটু ঝাপসা লাগছে। তবে অনেকদিন পরে নিজেকে সুন্দর দেখতে পেল হরিমতী। এখনও চুল পাকেনি—দুএকগোছা কোথাও লুকিয়ে থাকে বটে। ওটা নিশ্চয় 'বায়ুদোষ'। আরও কমবয়সে কি চুল পাকে না লোকের ?

তারপর পুরনো সিঁদুর কৌটোটা তাক থেকে হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল হরিমতী। লজ্জা করে—বড্ড লজ্জা করে। নিজের হাতে যদি পরিয়ে দেয় বেন্দা, পরবে। তখন লজ্জা করবে না।

শেষে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে আমগাছটার তলায় দৃষ্টি রেখে গয়নার বাকসোটার কথা ভাবতে থাকল হরিমতী। আবার লোভ গরগর করে উঠল বুকের মধ্যে। গয়না পরবে, না, পরবে না—তাছাড়া বেন্দারই বা কোনো মতলব আছে কি না—তাও বুঝতে পারছে না, বড় সমস্যায় পড়ে গেল হরিমতী।

বেন্দা বাগ্দিপাড়ার পুকুরে বৃষ্টির মধ্যে অনেক্ষণ ডুব সাঁতার খেলে ফিরল যখন, তখন গমসেদ্ধ শেষ করে হরিমতী দুটো টিনের থালায় জুড়োতে দিয়েছে। রাতের রান্না করা মাগুরমাছ গরম করে দুটো পাতে ঢেলেছে।

বেন্দার ভেজা লুঙি দাওয়ায় চালের বাতায় গুঁজে মেলে দিল হরিমতী। ছেঁড়াফাটা ধুতিটা ফটফটে সাদা করে কেচে রেখেছিল। বেন্দা ফেরতা দিয়ে পরে হরিমতীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর ফিক করে হাসল।

হরিমতী বলল, হাসলি যে ?

কপালে টিপ পরেছ। বড় সুন্দরী লাগছে হরিমতীকে। তাই হাসছি।

হরিমতী রাঙা হয়ে বলল, ওই ! উ কী রে ? নাম ধরে ডাকলি —বড় বাড় বেড়েছে, না ?

দাঁড়াও, একটুখানি দাঁড়াও। তোমাকে দেখি মাইরি!

ঢ্যামনামো রেখে পাতে বস্। জুড়িয়ে গেল।

জুড়োক। তুমি জুড়িও না—তাহলেই হল। ...বেন্দা দুহাতে হরিমতীকে শূন্যে তোলার চেষ্টা করল। পুরোটা ওঠাতে পারল না পাদুটো ছুঁয়ে রইল মেঝে।

হরিমতী পড়ে যাবে বলে কিংবা নায়িকার চাপল্যে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। বলল, ওই ওই! ই কী দিনদুপুরে! ও বেন্দা! ছাড়, ছাড়। কেউ দেখলে কী বলবে?

দেখতে কেউ বাকি আছে। বলে বেন্দা শেষ অব্দি তাকে নামিয়ে দিল। হাঁফিয়ে উঠেছিল অল্পবয়স্ক নায়ক। নায়িকার বয়সের প্রায় অদ্ধেক তার বয়স। হাঁফাতে হাঁফাতে ফের বলল, তোমার মাইরি 'ওজন' বেড়েছে।

হরিমতীর মনে প্রেমের ছোঁয়া গাঢ়। আবিস্টভাবে অস্ফুট করে বলল, বেন্দা! আমার সিঁথেয় একটুকুন সিঁন্দুর দিবি? শেষকালটা সধবা হয়ে কাটাই! দিবি বেন্দা?

বেন্দা বলল, কৈ সিঁন্দুর?

হরিমতী ঘরে ঢুকে তাক থেকে সিঁন্দুর কৌটোটা পাড়ল আবার। কতকাল আগে কেনা সিঁন্দুর। মাঝেমাঝে চৌকাঠের মাথায় আর দেওয়ালের স্বস্তিকাটাতে ঘষে উজ্জ্বল করে দেয়। তলায় ঠেকেছে। কৌটো খুললে বেন্দা আঙুলে চিম্‌টে করে তুলে বলল, কৈ এস।

হরিমতী মাথায় তার প্রায় সমান। সিঁথি পেতে আস্তে বলল, দাও।

সিঁন্দুর দিলে সে সধবাদের মতো মাথায় ঘোমটা টেনে বেন্দার পাদুটোতে মাথা ঠেকিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল। বেন্দা আমুদে ভংগিতে হাত তুলে বলল, আশীর্বাদ করি—আশীর্বাদ করি।

হরিমতী দ্রুত উঠে বলল, ছিঃ! ঠাট্টা করতে নেই। আমি তোমার হলুম আজ থেকে।

বেন্দা দুহাতে জাপ্টে ধরে বলল, ওরে আমার বউরে! আমার হরিমতী বউরে! আমার বোষ্টুমী বউরে!

হরিমতী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি কি এখনও ভাবছ ঠাট্টা?

বেন্দা চোখে হেসে মাথা দোলাল। না না। মাইরি বলছি, তোমাকে বড্ড সুন্দরী লাগছে।

আবেগে দুলতে দুলতে হরিমতী বলল, খেতে বসো। জুড়িয়ে গেল। আজ রেতের বেলা বরকত চালগুলো রেঁধে আমরা ভাত খাব! হাঁড়িতে জিয়ানো মাগুর মাছ আছে। ঝোল করব।

বেন্দা বলল, তুমি চান করবে না?

আমি তো রোজ ভোরবেলা চান করি। জানো না?

দুজনে যতক্ষণ খেল, আর কথা বলল না। খাওয়ার পর হরিমতী ঢেকুর তুলে বলল, তোমার বোধ করি কম হল ভাগে?

বেন্দা বাঁকা মুখে বলল, ধুস! জোর করে অতটা খেলুম। তোমার ডবল। আমার গমসেদ্ধ মুখে রোচে না।

হরিমতী বলল, আমারও কি রোচে? চালের যা দর।

কাল রাতে এক প্যাকেট সিগারেটও এনেছিল বেন্দা মনসার থানের মেলা থেকে। দাওয়ার উনুনের আগুনে ধরিয়ে এনে বলল, খাবে নাকি একটা?

হরিমতী তালাই বিছিয়ে বলল, দুটান দিও। ওতেই হবে। আমার আর তত ভাল্লাগে না?

বেন্দা বাইরে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, কাড়ান হয়ে গেল। দিনটা বড় ভাল। এই শোনো! এলে পুকুরে জল ঢুকছে 'জোলের'। জালি থাকলে মাছ ধরতুম অনেক। তোমার ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি থাকলে দিও।

তালাইয়ে পা ছড়িয়ে বসে হরিমতী বলল, আর ভিজতে হবে না। জ্বরজ্বালা হবে। চুপচাপ শুয়ে থাকো দিকিনি। পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছি।

বেন্দা সিগারেটটা ওর হাতে গুজে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বলল, দরজাটা আটকে দাও না। চোখে আলো লাগছে।

হরিমতী সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল, তোমার বাপু মতলব ভাল না। দিনদুপুরে ওসব কী?

বেন্দা খি খি করে হাসতে হাসতে বলল, আমার মাইরি মোনটা ছটফট করছে জানো? পুকুরে যা দেখে এলুম। উরে ব্বাস!

হরিমতী একটু উঠে দরজার বাইরে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কপাট দুটো ঠেলে দিল। ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। ছোট্ট দুটো খুলখুলি মতো আছে উঁচুতে বাঁশের বাতার গারদদেওয়া। রোদ্দুর থাকলে একটু আলো আসে। এখন বৃষ্টিতে পৃথিবী ধূসর হয়ে আছে।

হরিমতী বলল, কী দেখলে?

বাঁকুদার বউ চান করছিল। বেন্দা ফিসফিস করে বলল। ভেবেছে বিষ্টিবাদলায় পুকুরে কে আর আসবে। আমি গিয়ে পড়তেই গলা ডুবিয়ে বসে পড়েছে।

হরিমতী ওর মুখে হাত চেপে ফুঁসে বলল, পরের বউয়ের গতর দেখে এসে আবার গপ্প করা হচ্ছে? আমার মতো মেয়েটাকে পেয়েও খাঁকতি মিটল না? কী আমার পালোয়ান মরদ রে!

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বেন্দা বলল, বাঁকুদাটা বুড়ো হাবড়া। পড়ত আমার মতো লোকের হাতে! তারপর সে বাঁকার বউ ভানুমতীর শরীরের একটা অশ্লীল বিবরণ দিতে থাকল।

হরিমতী তাকে থামচাতে শুরু করল। বেরোও আমার বাড়ি থেকে। যাও, বাঁকার মাগের কাছেই যাও নেমকহারাম!

বেন্দা বলল, আহা হা হা! এমন করো কেন? কথার কথাই বলছি।

আমি থাকতে তোমার অন্য মেয়ের দিকে চোখ যাবে ক্যানে?

এ্যাই! আবার কান্না কাটি! মাইরি, তোমার সবই ভাল—শুধু এটুকুই বড্ড খারাপ।

হরিমতী আস্তে বলল, আমাকে ভাল না লাগলে চলে যাও।

যাব?

হ্যাঁ যাও।

বেন্দা উঠল। তারপর দরজা একটু ফাঁক করে দেখে তখুনি বন্ধ করে বলল, উরে শালা কী বর্ষণ বর্ষাচ্ছে! নদীতে বান এসে যাবে রাতারাতি।

হরিমতী বলল, গেলে না যে?

বেন্দা হরিমতীর ওপর আছাড় খাওয়ার মতো পড়ল। তারপর অন্ধকারে কিছুক্ষণ যুটোপুটির শব্দ। তারপর স্তব্ধতা। বাইরে মেঘের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। বেন্দা বলল, তোমাকে ছেড়ে এমন দিনে কোথায় যাব বলো? তোমার সিঁথেয় সিঁন্দুর দিলুমই যখন, তখন তুমি আমার বউ। বউকে ফেলে পুরুষমানুষ পালায়, না পুরুষ মানুষকে ফেলে বউ পালায়? তুমি যেন পালিওনা হরিমতী, তাহলেই হল।

হরিমতীর বুকের ওপর মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে বেন্দার ঘুম আসছিল। হরিমতী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বাবুর বাগান বৃষ্টির মুখে গাছ-গাছালি কেঁপে উঠছিল। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হরিমতী ভাবছিল, কালই একসময় সুযেগে বুঝে গয়নার বাকসোটা তুলবে—বেন্দা যখন থাকবে না ত্রিসীমানায়, তখন।...

ভানুমতীর বিপদ

কমলাক্ষের বাড়িটা একতলা। বারান্দায় বড় বড় থাম। মধ্যিখানে উঠোন এবং তিনদিকে ঘর। নদীর পারে গ্রাম বলে উঁচু ভিটেয় ঘর বানানো এই এলাকার রীতি। উঠোন থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিঁড়ি বারান্দার মাথায়। সিঁড়ির ধাপে বসে আছে ঘোমটা টানা ভানুমতী। আকাশ জুড়ে টুকরো নীলের খোপে সাজানো সাদা মেঘের ডাকের সাজ কমলাক্ষ বাড়ি ঢুকতেই কমলা বললেন, চৌকিদারের বউ কী বলছে শোনো।

কমলাক্ষের গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙি, খালি পা। হাত গাড়ু। বাড়িতে পায়খানা আছে বটে, দেশজ অভ্যাস অনুসারে এখনও মাঠে ঘাটে—বিশেষ করে ইটভাটায় কাজটা সেরে আসেন। জমিজমা

মুনিশের কাজও তদারক হয় সেই সুযোগে। গাড়ু রেখে কানের পৈতে খুলে মাজবার ভংগি করে বললেন, কী গো বউ?

ভানুমতী ঘোমটার ফাঁকে বলল, চৌকিদারের অবস্থা খারাপ বাবুমশাই। অম্বলের ব্যারামটা বড্ড বেড়েছিল। আজ মধুপুর হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, পেটের ভেতর গোটা হয়েছে।

কী হয়েছে?

আজ্ঞে গোটা। বাঁকা চৌকিদারের বালিকা বধূ হাতের মুঠোয় বুঝিয়ে দিল।

কমলাক্ষ একটু হাসলেন! অ-টিউমার! তা আমি কী করব বলোদিকি বউ?

ভানুমতী রোগা মেয়ের স্বরে বলল, ডাক্তারবাবু বললেন, শহরের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। পেট কেটে গোটা বের করবে।

কমলাক্ষ বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন। তা তো করবেই। তবে আমাকে কা করতে হবে. সেটাই বলো দিকি বউ? আমি এক্ষুনি বেরুবো।

আজ্ঞে বাবুমশাই, টাকাকড়ি তো কিছু লাগবে। ভানুমতী বলল। তাই চৌকিদার বললে, বাবুকে গিয়ে বলো—কাঠা দশেক জমি বন্ধক রেখে যদি শতুয়েক টাকা দেন···

কথা কেড়ে অস্থির হয়ে কমলাক্ষ বললেন, টাকা? তোমার মাথা খারাপ? এই তো ওমাসে মনোদাকে এককাঁড় টাকা দিতে হল। তার ওপর মঞ্জুর বিয়ের দিন পড়েছে এ মাসে। আমার ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন তো টাকাকড়ি দিতে পারব না বউ!

কমলা থামে হেলান দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, হাসপাতালে তো টাকা লাগবে না গো! টাকা কী করবে?

ভানুমতী বলল, টাকা না দিলে ভর্তি করবে না গিন্নিমা।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার বাবু বলেছে! টাকা না নিয়ে গেলে বলবে সিট নেই।

কমলাক্ষ বললেন, দুর্নীতি! দুর্নীতিতে দেশটা গোল্লায় গেল। তুমি বরং সুখেনকে গিয়ে ধরো বউ। ওরাই তো এখন নেতা হয়েছে।

ভানুমতী বলল, বাবা রে বাবা! সুখেনবাবুর যা মেজাজ হয়েছে। কাল কষ্ট করে লোকটা গিয়েছিল। উল্টে ধমকা-ধমকি করেছে। বলেছে, আমার অত সময় নেই। ভানুমতী ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়তে থাকল।

কেন কেন? বলে কমলাক্ষ হাঁক দিলেন, পঞ্চা! এখানেই দুবালতি জল দে। চানটা সেরে নিই।

পঞ্চা বাবু-বাড়ির নতুন মাহিন্দার। জমি-জমা তদারক করে, আবার বাড়িতেও খাটে। বেন্দা এ্যাদ্দিন এ বাড়ি টিঁকতে পারলে তারই মাহিন্দার হবার কথা ছিল। পঞ্চার সাড়া পাওয়া গেল টিউ-বেলের হাতলের বিকট শব্দে। সে স্বভাবতঃ কথা বলে কম। কিন্তু ভানুমতীর হয়ে জবাব দিল। ...সুখেনবাবু চটে যেয়েছে চৌকিদারের ওপর। মধুপুরের চন্দ্রবাবুকে নাকি কী সব কথাবার্তা 'লাগান-ভাঙ্গান', করেছে কবে। কিন্তু পঞ্চা দাঁত বের করে হাসল। আজ্ঞে মশাই, পাট্টাপাট্টির ব্যাপার।

পাট্টাপাট্টি অর্থাৎ রাজনৈতিক দলাদলি। কমলাক্ষ গেঞ্জি খুলেছেন ইতিমধ্যে। ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন কমলার উদ্দেশ্যে। কমলা স্বামীর ঘর্মাক্ত গেঞ্জি বাঁ হাতের অঙ্গুলে তুলে থামের কোনায় রাখলেন। কাচতে দেবেন অন্নকে। অন্ন এখন দুধ দুইতে গেছে বাইরের গোয়াল-ঘরে। দুধ চুরি সামলাতে মায়ের নির্দেশে মঞ্জু বাছুরের গলার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু চুপ। গম্ভীরমুখে আকাশ দেখছেন। কমলা কাচের সুদৃশ্য পাত্রে খাঁটি সরষের তেল এনে ধাপে রাখলেন। তখন তেল মাখতে শুরু করলেন। ভানুমতী মরীয়া হয়ে বলল, ধানের গুছি রোয়া আছে জমিতে, বাবু। হেঁতাই তলার জমিখানা। এইমাত্তর দেখে এলুম, গুছিতে রঙ ধরেছে। আগুণ মাসে ধান কেটেই জমি ছাড়িয়ে নোব।

কমলাক্ষ আনমনে বললেন, কাল একবার এস। ভেবে দেখি।

আশা পেয়ে ছটফট করে ভানুমতী বলল, এখন-তখন অবস্থা বাবু। ধড়কড় করছে সবসময়।

তা বললে কী হবে? কমলাক্ষ বিরক্ত হয়ে বললেন। আমাকে ভাবতে হবে না? অতগুলো টাকা!

ভানুমতী আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলে কমলা প্রশংসার সুরে বললেন, চৌকিদারের বউটা খুব হিসেবী! এতটুকুন মেয়ে—মঞ্জুর বয়সী। অথচ হাড়ে হাড়ে পাকা।

কমলাক্ষ ফিক করে হেসে গলা চেপে বললেন, সব ব্যাপারেই পাকা। ফাঁড়ির সেপাইদের সঙ্গে যখন হাসাহাসি করে আর তাড়ি পরিবেশন…

কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। কমলা বললেন, তোমার শকুনের দৃষ্টি ওখানেও পড়েছে? মেয়ের বয়সী বউটা। ধিক্ তোমাকে।

কমলাক্ষ স্বচক্ষে দেখেন নি। তাই কথা না বাড়িয়ে হাঁক দিলেন, হল রে পঞ্চা?

ভানুমতী তখন হনহন করে হাঁটছে। রাস্তার মাঝখানে পাঁক জমেছে। গরু মোষের পায়ের ছাপ পড়ে আছে সারা রাস্তা। কিনারায় একফালি মসৃণ শুকনো পায়ে চলা পথ ধরে ভানুমতী বকুল গাছের তলায় একবার দাঁড়াল। মোড়লপাড়ার বুড়োরা আড্ডা দিচ্ছে। কেউ শণের দড়ি কাটছে। কেউ জাল বুনছে। মাঠঘাটের গল্প করছে। ভানুমতীকে দেখে ঘোলাটে চোখে তাকাল একবার। ভানুমতী সুখেনদের বাড়ি ঢুকল।

সুখেনের মা মোড়লগিন্নি বলল, কে গো মেয়েটা?

ভানুমতী আস্তে বলল, আমি চৌকিদারের ঘরের লোক, মা! সুখেনবাবু নেই?

সুখেন? সে কি এখন বাড়িতে থাকে বাপু? মোড়লগিন্নি নাতিকে কোলে তুলে নিল উঠোন থেকে। ন্যাংটো নাতির এক পায়ে

রূপোর সরু মল। সারা গায়ে ধুলো। ঠাকমার নাক চুষতে থাকল।

কখন দেখা পাব, মা ?

মোড়লগিন্নি নাতির সুখে আপ্লুত। বললেন, মধুপুর ইস্কুলে আছে সুখেন।

ভানুমতী যেন পণ করে বেরিয়েছে, আজই টাকার হেস্তনেস্ত করে মরদটাকে শহরে নিয়ে যাবে। হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে ছাড়বে না। সুখেনবাবু মেয়ে মানুষের কথায় যদি নরম হয়ে একটি ব্যবস্থা করেন! কমলাক্ষ বাবু তো রইলেনই। নিম রাজি হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। আশা—নিরাশায় দুলতে দুলতে ভানুমতী গোড়হর হয়ে নদীর ধারে বাঁধে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে সাদা ব্রিজ ঝকঝক করছে উজ্জ্বল রোদে। তার ডানদিকে হাইওয়ের ধারে মধুপুর বাজার ছবির মতো দিগন্ত আঁকা রয়েছে। যাবে ভানুমতী ইস্কুলে! সে নাকচাপি খুঁটতে থাকল হিজল গাছের ছায়ায়।

মনটা হঠাৎ দমে গেল। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হত। একা যেতে কেন যেন বড্ড গা বাজছে। ভানুমতী ভাবল, মনা—ভাসুরের মেয়ে সুরিকে ডেকে আনবে নাকি। কিন্তু সুরি কি বাড়িতে বসে আছে এখন ? হয়তো মায়ের সঙ্গে জাম পাড়তে গেছে বাওড়ের দিকে। নয় তো মাঠের আলে শাক তুলতে। বৃষ্টির জলে ছালিকে শাকের পাতা ডাগর হয়েছে। মুসুর ডালে ছালিকে শাক —জিভে জল এসে যায়।

সেই সময় নদী থেকে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল বেন্দা! হাতে ছোট মাটির ভাঁড়ে কেঁচো ভর্তি। সারগাড়ার কালো মাটির মধ্যে কিলবিলে কেঁচো চুপ চাপ পড়ে আছে। বেন্দা এদিকে পিছন ফিরে ছায়ায় বসে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। খান দশেক বড়সি দিয়েছে নদীতে। দশ হাত অন্তর কঞ্চির মাথা থেকে শনের শক্ত সুতো ঝুলছে বড়সীতে কেঁচো গাঁথা। জলের স্রোত ছুঁয়ে বড়সী তির তির করে কাঁপছে মাছ বিধলেই জলের শব্দে সে টের পাবে।

বেন্দা ঝাঁকড়া চুল থেকে আধখানা বিড়ি বের করে এদিক ওদিক তাকিয়ে আগুন খুঁজতে থাকল। কাছাকাছি মুনিশ জন বা রাখাল

কাউকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হল। মধুপুরের জোলা পাড়া থেকে একটা লোক তাঁদের গামছা বেচতে যাচ্ছিল গাঁওয়ালে, তখন তার কাছে আগুন নিয়ে এই বিড়িটার আধখানা খেয়েছে। এখন বাকিটা খেতে মন ছটপট করছে।

ভানুমতীকে দেখেই বেন্দার চোখ নিষ্পলক হয়ে গেল। চৌকিদারের বউ নিচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়লে ঘোমটা টা টেনে দিল। বেন্দা কথা বলবে, না বলবে না—তাই নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছে। ভানুমতীরও একই অবস্থা। একটু করে বেন্দা সাহসে রসিকতা করে বলল, লোত্‌নী নেতুনী— (অর্থাৎ নতুন বউ, তার অপভ্রংশ) নাকি ? ছাগল খুঁজে বেড়াচ্ছ তা ইখেনে তো এই বেন্দা ছাড়া আর কেউ নেই। বেন্দাকে যদি ছাগল ভাবো, বেঁধে নিয়ে যাও। তবে লেজ তুলে দেখো আগে।

তারপর খি খি করে অনেকটা হাসি। ভানুমতী রসিকতাকে পাত্তা না দিয়ে দুঃখে হেসে বলল, দেওর কি বঁড়শী দিয়েছে নদীতে ? পেলে কিছু ?

এবার পাব। বেন্দা বলল। লেত্‌নীর মুখ দেখলুম। এবার পাবই পাব।

দেওরের খালি সব সময় ঠাট্টা। ভানুমতী বলল। একটা কথা বলব—রাখবে ?

বেন্দা চঞ্চল হয়ে বলল, হুঁউ। বলেই দেখ না লোত্‌নী ? কি বললে

আমার সঙ্গে একবার মধুপুর যাবে ? সুখেন বাবুর ইস্কুলে। বলল। একা যেতে বড্ড গা বাজছে।

বেন্দা উঠে এল বাঁধে। বলল, ব্যাপার কী বলোদিকিনি লোত্‌নী ?

তোমার চৌকিদার দাদার অবস্থা ভাল না। ভানুমতী ইনিয়ে বিনিয়ে আগাগোড়া শোনাতে থাকল। বেন্দার সঙ্গে এতদিন তার এতবেশি কথাবার্তা হয়নি। কদাচিৎ বেন্দা চৌকিদারের বাড়ি গেছে নানা ধান্দায়। একেবারে অচেনা নয় পরস্পর। কিন্তু নিরিবিলিতে পরপুরুষ

এবং পরনারীর মধ্যে কথাবার্তা কেমন যেন দেখায়। গুরুতর না কিছু ঘটলে ভানুমতী অল্প কথা বলেই চলে যেত এখান থেকে।

সব শুনে বেন্দা বলল, বাঁকুদা বড্ড ভাল মানুষ। এতটা হয়েছে, তা তো জানতুম না। যে জিভ চুক চুক করে দুঃখপ্রকাশ করল। ফের বলল, তোমাদের বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয়নি কি না। আমার শালা আজকাল যা কাজ পড়েছে। মুনিশ খাটছি—রোজ তারপর বেলা পড়লে মধুপুরে গিয়ে ধান্দা করছি, বলবে ধান্দাটা কিসের? তোমাকেই বলছি লোত্‌নী—কাউকে বলো না। আমি রিকশা চালানো প্যাক্টীস করছি।

ভানুমতী বলল রেকশা? জানো দেওর, আমার মামাতো দাদা রূপপুরে রেকশা চালাত। হাঁপের অসুখ হয়েছিল। রেকশা ভালো না বাপু।

বেন্দা গ্রাহ্য না করে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এগোও লোতনী। বড়শীগুলায় একবার চোখ বুলিয়ে আসি। চাই কি, একটা আড় গেঁথে গেলে বাজারে বেচে আসব।

বলে সে দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে ঝোপঝাড় ঠেলে নদীর কিনারায় চলে গেল। ভানুমতি হাঁটতে থাকল। হাঁটে এবং পিছু ফিরে দেখে বেন্দা আসছে নাকি। বেন্দাকে তো বলা যাবে না। মধুপুরে [illegible] আসল ভয় ফাঁড়ির পুলিশের হাসপাতালে মরদকে নিয়ে [illegible]গিয়ে [illegible] পাল্লায় পড়বি ভয়ে সে ঘোমটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ছিল। ছোট্ট [illegible]রের পা চলে না, এমন অবস্থা। ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে [illegible]য়ার জন্য বাঁকা বাড়ি ফিরে গাল মন্দ করে ছিল রাগের চোটে।

বেন্দা দৌড়ে সঙ্গ নিয়ে বলল, বড় শেয়ানা হয়ে উঠেছে নদীর মাছগুলো। লোত্‌নী বাড়ি এসে আমাকে কিন্তু এককিলো চাল দিতে হবে। একটি মুনিসের অর্দ্ধেক মজুরি! না দিলে চলবে না বাপু। তোমাদের জমিজমা আছে। ঘরে চালের অভাব নেই।

ভানুমতী মনে রাগ করে সুখে বলল, অত পারবনা দেওর। এক কাঠা দেব।

ঠিক আছে। দেড় কাঠা দিও। বেন্দা রফা করল।—

হাইওয়ের এক দিকে বাজার, অন্যদিকে ধু ধু মাঠ! বাজারের আগেই মধুপুরে আদর্শ বিদ্যাপীঠ। পথে বেন্দা বেজায় বক বক করেছে। ভানুমতির সাড়াশব্দ নেই। একতালা সারবন্দী তিনদিকে ঘর স্কুলের, সামনে ফুলবাগান। তার একধারে খেলায় মাঠ। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ভানুমতী কৃষ্ণ চূড়ার ছায়ায়। এখনও লাল ফুলে দগদগে হয়ে আছে গাছটা। বেন্দা ভয়ে ভয়ে বারান্দায় উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ভানুমতি চঞ্চল দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সুখেন ক্লাস এইটে ইতিহাস পড়াচ্ছিল। জানালা দিয়ে বেন্দাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে কোন খারাপ এনেছে ভেবেছিল। বলল, কী হয়েছে বেন্দা?

বেন্দা আচমকা তাকে সামনে দেখে ভড়কে গেল। দ্রুত আঙ্গুল তুলে গেটের কাছে ভানুমতীকে দেখিয়ে আমতা হেসে বলল, আজ্ঞে বাবু দাদা চৌকিদারের বউ আপনাকে দেখা করতে এসেছে।

অমনি সুখেন খাপ্পা হয়ে গেল —তা এখানে কী? এ্যা? এখন দেখা করার সময়? অঞ্চল অফিসে আসতে বল্‌গে যা। নয় তো সন্ধ্যার পর বাড়িতে। তোঁদের জ্বালায় দেখছি মরে গিয়েও রেহাই পাবনা।

বেন্দা সভয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

ভানুমতী ব্যাকুল হয়ে বলল, কী বললে, দেওর? কি বললে বাবু।

বেন্দা পা বাড়িয়ে গুম হয়ে বলল, শালার লাখ টাকার মেজাজ। বললে বিকেলে অঞ্চল অফিসে আসতে। নৈলে সনজে বেলা বাড়িতে।

ভানুমতী চুপচাপ হাঁটতে থাকল। এবার মনে হচ্ছে চৌকিদার শুনলে গালমন্দ করবে। এমন করে ঝোকের মুখে এখানে আসাটা ঠিক হয়নি—তাছাড়া বেন্দার সঙ্গে এসেছিল শুনলে তো ক্ষেপে

যাব। বেন্দা যে নষ্ট মেয়ে বোষ্টুমীর সঙ্গে থাকে এতক্ষনে তীব্র হয়ে ধরা পড়ল মনে।

ভানুমতী মনে মনে মরদের উদ্দেশ্যে মাথাকুটে বলল, আমার মাথার ঠিক ছিল না গো, আমার মাথার ঠিক ছিল না। সারারাত অমন করে তুমি পড়া মাথায় করে যন্ত্রন্নায় কাঁদলে। আমি মেয়ে মানুষ—কী অত বুঝি বলো?

বেন্দা বলল বাঁকুদা ওই সুখেনশালার ফরমাস খেটে হাল্লাক হয় নি? আমি দেখিনি? বোনের বিয়ের তত্ত্ব যাবে। তাও ওই চৌকিদারকেই যেতে হবে। সনজেবেলা কী দুপুররাত—কোনো কাজ লাগলেই ডাক্ চৌকিদারকে এখন কেমন রোয়াব দেখছ শালাদের? পিথিমাটাই এমন। বুঝলে লোত্‌নী? ভালর কাল আর নেই।

বেন্দা দার্শনিক হয়ে গেল হাইওয়েতে। কান ঝালাপালা দিচ্ছিল ভানুমতীর।

নদীর ধারে হিজলতলায় পৌঁছে যখন ভানুমতী গোডহর হয়ে গাঁয়ে চলে গেল, তখন বেন্দার মনে পড়ল—আরে তাই তো! এক বৃষ্টির দিনে পুকুরপাড়ে ঝোপে লুকিয়ে এই মেয়েটারই ন্যাংটো শরীর দেখে পাগল হয়ে উঠেছিল সে।

বেন্দার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন খারাপ হয়ে গেল, কেন মাছধরার আনন্দভরা আশা, বাবুর বাগানে হরিমতার সিঁথের নিলাজ সিঁদুর এবং তার বুকে মুখে গুঁজে বেঘোর ঘুম কেন বড্ড বাজে ব্যাপার মনে হল, সে বুঝতে পারছে না।

ওবেলা গিয়ে চালটা যখন আনবে, ভানুমতীকে ভাল করে দেখবে বেন্দা।

হরিমতীর গয়নাগাঁটি

এতদিন বাদে অন্ন এসেছিল বোনপোকে উদ্ধার করতে। বাবুর ছোটমেয়ের বিয়ে লেগেছে। বাড়িতে আত্মীয়কুটম্বের খই ফুটছে।

বাবুর বাড়ি এখন কত কাজ। বেন্দা থাকলে এসময় বড্ড ভাল হত। কীভাবে ভাল হত। কীভাবে ভাল হত অন্ন জানে না। কিন্তু মন বলছে, বেন্দাটা বাবু এবং বাবুর গিন্নির হাতনড়িটা হতে পারত। আর সব মেয়ের বিয়েতে বেন্দা খুব খাটা-খাটনি করেছিল। সুনজরে পড়েছিল ওনাদের। মাহিন্দারি চাকরিটা প্রায় পেয়ে যাচ্ছিল, বেন্দার মতি টলল হটাৎ। ভাঁড়ার থেকে মুড়ি চুরি করে খেয়েছিল, সেটা কারণ হয়তো নয়—আসল কারণ খিড়কির পুকুরে মেয়েরা চান করার সময় বেন্দার ঈশানকোণের ঝাঁকড়া বটগাছের ডালে শোয়া অভ্যাস হনুমানের বরাবর। কোন মেয়ের চোখে পড়ায় গিন্নিমার কানে তুলেছিল। তাই নিয়ে সে এক অনাছিষ্টি সন্ধ্যেবেলা। বেন্দা আর এ-বাড়ি ঢোকেনি।

বাবুর বাগানের কাছে এসে নিচু পাঁচিলের ওধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষদৃষ্টে অন্ন হরিমতীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনেমনে একশো গাল শান দিয়ে ধারালো করতে থাকল।

হরিমতী এদিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। বেন্দাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে অন্ন তৈরী হয়ে ডাকল চেরা গলায়। বেন্দা! বেন্দা আছিস? অ বিনোদ!

হরিমতী ঘুরতেই থ বনে গেল অন্ন। তার মনে হল স্বপ্ন দেখছে নাকি। হরিমতীর সিঁথেয় সিঁন্দুর, ভুরুর মধ্যে লাল টিপ মারমূর্তি হয়ে আছে। আর হরিমতীর গলায় সরু চেন, হাতে রুলি, কানে দুল। অন্ন যখন সধবা ছিল, গোবিন্দের আমলে হরিমতীকে এরকম দেখেছে। সবচেয়ে অবাক লাগছে, তাহলে এত কষ্টের মধ্যেও বেচে খায়নি গয়না-গুলো? কোমরে চাঁদির বিছে অবশ্যি নেই, পায়ের আঙুলের ঝুমঝুমি-গুলোও। অন্ন টের পেল, বেন্দা কোথায় আটকা পড়েছে।

গাল দেবে কী, হরিমতীর রূপান্তর দেখে অন্ন শুধু ভড়কে যায়নি, বুকের ভেতরে একটা কষ্ট ঠেলে উঠছে। বোকা অবুঝ বাপ-মাহারা ছেলেটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে কামরূপ-কামিখ্যের ডানি!

হরিমতী হাসছিল।...তোমার বোনপো এখন থাকে? হরিমোড়লের সঙ্গে শহরে গেছে। মোড়ল ডেকে নিয়ে গেল ভোরবেলা।

অন্ন চুপচাপ ঘুরল। অতদূর থেকে তেড়ে এসেছিল ঝগড়া করতে। পারল না। বেন্দা থাকলে নিশ্চয় পারত। হরিমতীর রূপ দেখে ভড়কে গেল। কী খেয়ে এমন গতর লেগেছে ওর? টাকাকড়ি পোঁতা ছিল নাকি? রাস্তায় যেতে-যেতে অন্ন নিরিবিলি মুখ খুলল। কেন এমন অধম্ম লোকে চোখের ওপর সইছে? কেন এখনও হারামজাদীর চুল কেটে মাথা ন্যাড়া করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না? আগের দিন হলে কবে এর একটা প্রচণ্ড প্রতিকার হয়ে যেত না কি?

শেষে চেঁচিয়ে বলতে থাকল, এ জংলা গাঁয়ের ধারাই যে এরকম। এখানে কি মানুষ বাস করে? সবাই বনের জন্তু, জন্তু, জন্তু! সারা পথ সে জন্তু জন্তু করতে করতে গেল।

অন্ন এমন বকবক বারোমাস করে। লোকের কানসওয়া। কেউ জিগ্যেসও করল না ব্যপারটা কী বাবুর বাড়ির কাছে গিয়ে অন্ন চুপ করল। তারপর তার মনে ধাঁধা ঢুকল। বেন্দার সঙ্গে মন্তরটন্তর পড়ে শাস্তর অনুসারেই কি 'স্যাঙা' অর্থাৎ বিয়েটা হয়েছে? তা নৈলে কোন সাহসে সিঁদুর পরে? নিশ্চয় শহরে গিয়ে মাকালীর মন্দিরে-টন্দিরে পুরুতের মারফত ব্যাপারটা হয়েছে।

আর তা হয়েছে বলেই গ্রামে এই রহস্যজনক নৈশব্দ বেন্দা-হরিমতীর ব্যাপারে। একটু পরে অন্ন বাবুবাড়ির কাজের মধ্যে ডুবে বেন্দাকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলল।

তখন হরিমতী বাঁকা মুখে আপনমনে হাসছে। অন্ন কোমরবেঁধে ঝগড়া করতে এসেছিল, তাতে কোন ভুল নেই! বেন্দা থাকলে ঝগড়া না করে যেত না। ভাগ্যিস বেন্দা নেই। হরিমতী ঝগড়াঝাঁটিতে একেবারে আনাড়ি।

বাগান জুড়ে এখন জোরালো সবুজ চারপাশে। বেন্দার পোঁতা চারাগুলো লকলকিয়ে উঠে ঝাড় মেলেছে। জামগাছে জাম পেকেছে। পাখপাখালি খুটে খাচ্ছে। কলকলাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এসে ভয়ে ভয়ে পাঁচিলের ওপাশে পাকা জাম কুড়োয়। হরিমতী আপত্তি করে না। বেন্দা থাকলে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। গাছে

চড়ে আঁকশি দিয়ে ঝাঁকিয়ে জাম পাড়ে এবং ঝুড়িতে করে ধুয়ে বেচতে যায় মধুপুর বাজারে। বেন্দা আজকাল কত ধান্দায় ঘোরে সারাটা দিন। মুনিশের কাজ না থাকলে মাছধরাটা তো আছেই। চুরি-চামারির ধান্দাটা ছেড়েছে বলে মনে হয়। আজ হরি মোড়ল গেছে ভোরবেলা শহরে 'সালফেট' সার আনতে। রিকশো করে এনে ব্রিজে নামাবে। বাকি পথটা বেন্দা মাথায় করে বয়ে আনবে। বেন্দা হরিমোড়লের পায়ে-পায়ে ঘুরছে। বলে গেছে, মোড়লগিন্নি তোমাকে ডেকেছে। যেতে যেন ভুলো না।

চিরদিনের সেই আলসেমিটা ছাড়তে পারছে না হরিমতী। যাব-যাচ্ছি করে বাগানের একোণা-ওকোণা ঘুরছে সকাল থেকে। অন্ন যাওয়ার পর উত্তরের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে লাগল। ওই দেখা যাচ্ছে নদীর মাথায় উঁচু ঢিবির ওপর যুধিষ্ঠিরের কুঁড়েঘর। হরিমতীর অবাক লাগল, নেহাত দুটো ভাত আর কয়েক গেলাস তাতির লোভে সারা গ্রীষ্মকালটা লোকটার সঙ্গে শুয়েছে। কাজটা উচিত হয়নি। পাপ-পুণ্যের টনটনে জ্ঞান হরিমতীর এ জন্মে নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কি আর শোবার মতো পুরুষমানুষ ছিল না? তার চেয়ে বাবুর সঙ্গে শুলে ভাল খেতে-পরতে পেত। মুশকিলটা শুধু এই যে বাবুর যেন সে-দিনকাল আর নেই। চোখের সে-নেশাও আর নেই। যদি এসে পড়েছে কখনও, দুটো ফালতু রসের কথা বলেই কেটে পড়েছে। হরিমতী মুখ ফুটে টাকা ধার কিংবা দুকাঠা চাল চেয়েছে, বাবু বলেছে —এতখানি জায়গা দিয়েছি বিনিপয়সায়, আবার এটা সেটা চাইছিস কোন মুখে রে? জায়গাটা বাবুর বাবা দিয়ে গেছে। পরের ধনে পোদ্দারি!

আসলে যে-গতর দেখে পুরুষমানুষ পোকামাকড়ের মতো এসে ভনভনাবে, সেই গতর কাট হয়ে গিয়েছিল হরিমতীর। বেন্দার নবীন বয়সের ঘষা লেগে তার গতর চেকনাই হয়েছে। লোকেরা ট্যারা চোখে তাকিয়ে যায়। হেসে-হেসে রসের কথা বলতে যায়। হরিমতী মনেমনে বলে, এতকাল কোথায় ছিলি সব শ্যালকুকুরেরা।

যুধিষ্ঠিরের চুড়োবাঁধা মাথাটা নদীর কিনারায় উঠতে দেখা মাত্র হরিমতী সরে এলো। থুথু ফেলল। তারপর দরজায় তালা এঁটে আস্তে সুস্থে বেরুল।

হরিমোড়লের বাড়ির মেয়েরা তাকে দেখে মুখ টিপে হাসাহাসি করছিল। লজ্জায় হরিমতী লাল। বলল, অত হাসির কী আছে বাবু? গয়না কি কখনও পরিনি?

গয়না নয় বোষ্টুমী। হরি মোড়লের বড় ছেলের বউ সন্ধ্যা বলল। সিঁথেয় সিঁদুর পুরেছ—কবে তোমাদের স্যাঙা হল বলো দিকিনি?

হয়েছে সে-মাসে। বলে হরিমতী মোড়ল গিন্নির কাছে এগিয়ে গেল। মোড়ল গিন্নি দাওয়ার তক্তাপোষে বসে আছে। তাকে দেখে শুয়ে পড়ল। হরিমতী বলল, অ। তা আগে জানলে মালিশ বেঁটে নিয়ে আসতুম।

মোড়ল গিন্নি বলল, ব্রজেন কবরেজের কাছে মালিশ এনেছে। সাবধানে মালিশ করে দাও। দেখো যেন, ব্যাথা বাড়িয়ে দিও না।

দেয়ালের তাক থেকে মালিশতেল পেড়ে দিল। তারপর উপুড় হল মোড়লগিন্নি। কোমরের কাপড় সরিয়ে হরিমতী তেল মালিশ করতে লাগল। সেই ফাঁকে মোড়ল গিন্নি কথা বলতে থাকল হরিমতীর সঙ্গে। বেন্দা যে ভাল মানুষটি হয়ে উঠেছে, তা আজকাল ওর হাবভাবেই বুঝেছে মোড়লগিন্নি। আগে কেমন ধারা দৃষ্টি ছিল চোখের, দেখেই টের পেত কী মতলব নিয়ে ঘুরছে। ফাঁক পেলেই একটা কিছু নিয়ে পালাবেই পালাবে। গামছা হোক, গরু ডাকানো পাচন বাড়ি হোক, কিংবা একটা ঘটিবাটি হোক। আজকাল মুনিশ খেটে রোজগারপাতি করছে। গতর চেকনাই হয়েছে। মোড়লগিন্নি বোঝে, এসবই তো বোষ্টুমীর কাছে যাওয়ার পর। ভালই করেছিস বোষ্টুমী ওকে জায়গাখানি দিয়ে। লোকে পাঁচকথা বলছিল—কী জানি, কবে না দুজনকার ওপর জুলুম করে তাড়িয়ে দিত গাঁ থেকে। তার চেয়ে স্যাঙা করে ধম্মত মাগ-ভাতার হয়ে আছিস, ভালই করেছিস। মোড়ল বলছিল বেন্দা যদি সঙ্গে

থেকে মাঠঘাটে ঘোরে, এবছরটা আর হবে না—সামনে বছর মাহিন্দারী দেবে। বুঝিয়ে বলিশ বেন্দাকে।

হরিমতী ছোট্ট করে হুঁ বলল।

মোড়লের মেয়ে টগর হাসতে হাসতে বলল, বেন্দাকে আটকে রাখতে পারবে তো বোষ্টুমী? শিকলি কেটে না উড়ে দেখো!

মোড়লগিন্নি খেঁকিয়ে উঠল।......সক্কালবেলা তোর খালি অলক্ষুনে কথা টগর।

টগর দমল না। চাপা স্বরে এবং চোখের ঝিলিক তুলে বলল, মনা বাউরি তোমাদের নিয়ে সঙের গান বেধেছে জানো?

মোড়লগিন্নি আরামে উপুড় হয়ে থেকে হেসে ফেলল। ... মনা ওই রকমই। কাল আউসের পাঁজায় গরু ডাকিয়ে মাড়ন দিচ্ছে আর আপন মনে গাইছে। শেষে বলে, তা অন্যায় কিছু নয় বাপু। রাধিকার বয়স তো কেষ্টর চেয়ে বেশী ছিল। রাধা যখন যোবতী, কানাই তখন মায়ের কোলে দুধু খাচ্ছে

হরিমতী আস্তে বলল, কৈ, জাং মালিশ করে দিই।

তুই রাগলি নাকি বোষ্টুমী? মোড়লগিন্নি চিত হয়ে শুল।

হরিমতী হাসল শুধু।

মোড়লগিন্নি তার হাতের রুলি পরখ করে দেখে ছেড়ে দিল। আগের আমলের সোনা। না রে বোষ্টুমী? এমন গড়ন আজকাল আর স্যাকরারা জানেই না। এই দেখ্ না, চুড়িগুলো কী ছিরি কারছে।

হরিমতী বুঝল, তাকে টেক্কা দিতে গয়না দেখাচ্ছে মোড়লগিন্নি। দুহাতে দুগাছা করে সোনার চুড়ি। তার সঙ্গে মোটা পাতের দুটো রুলি। তার ওপর শাখা-নোয়া। বাহুতে অনন্ত। গলায় মস্তো চ্যাপটা হার। কানে ঝুমকো। ধানচাল খন্দের দর বেড়ে কয়েক বছরে হরিমোড়ল ফুলে উঠেছে। বউঝিদেরও গাভরা সোনা। হরিমতী মনেমনে রেগে গেছে। মুজফর ডাকুর চোখ কি তার মতো রাত কানা হয়ে গেছে? এবার যদি রাতবিরেতে এসে পড়ে, বলবে—

হরিমোড়লের বাড়ি সোনায় ঝলমল করছে। কিংকর বোরেগী ঠিক এমনি করে মুজফরকে মুলুক-সন্ধান দিত। হরিমতী গুম হয়ে জ্যাং মালিশ করতে লাগল।

মোড়লগিন্নি বলল, হ্যাঁ রে বোষ্টুমী! বাবুর মেয়ের বিয়েতে তোকে কাজে ডাকেনি?

হরিমতী মাথা দোলায়।

কেন রে? বাবুদের বাড়ি তোদের পুরনো সম্পর্ক। মোড়ল গিন্নি একটু অবাক হয়ে বলল। মঞ্জুর দিদিদের বিয়েতে ডেকেছিল, না ডাকে নি?

হরিমতী গলার ভেতর বলল, তখন ডেকেছিল।

টগর ফিক করে হেসে বলল, আর ডাকবে কেন? অন্নপুন্না থাকতে?

ফের হরিমতীকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা শুরু হল। বাড়িতে এক দঙ্গল বউ আর বালিকা। হরিমতী লাল হয়ে রইল রাগে ও লজ্জায়। আসলে গয়না পরে না এলে এতটা হত না। কাজ শেষ করে সে খিড়কির ডোবায় মাটি ও বুলি ঘষে মালিশের গন্ধ যতটা সম্ভব মুছে ফেলল। ফিরে এলে মোড়লগিন্নি বড় বউমাকে হুকুম করল, বোষ্টুমীকে দুকাঠা চাল দাও। চাট্টি মুড়িও দেবে।

হরিমতী মৃদুস্বরে বলল, গোটাকতক পেঁয়াজও দেবে বউ।

আঁচলে চাল এবং বুকের কাছে কোঁচড়ে পেঁয়াজ ও মুড়ি নিয়ে হরিমতী বেরুল। মেঘ ভেঙে রোদ উপচে পড়েছে। নিচু মাঠটুকু পেরিয়ে যেতেই দেখে, তার জামগাছে হনুমানের পালের মতো ছেলেপুলে দাপাচ্ছে। ডাল ভেঙে একাকার করেছে। তলায় একদঙ্গল ভিড় করে কুড়োচ্ছে। হরিমতীকে দেখতে পেয়েই সাড়া পড়ে গেল। কাছে যেতে-যেতে ধুপ ধাপ করে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে পালাল সবাই। হরিমতী মুখ টিপে হেসে বলল, বাড়ি থাকলে তোমাদের দেখিয়ে ছাড়ত!

অর্থাৎ বেন্দা। বেন্দার ভয়ে বাবুর বাগানের কাছে ছেলেপুলে পা

বাড়ায় না। এখন মনে হয়, যখন এ বাগানে ভরন্ত যৌবনের মতো ফুলফলের গাছ ছিল, তখন বেন্দা থাকলে কত ভাল হত। কিন্তু তখন বেন্দা হয়তো নডিহাতে রাখালী করে বেড়াত। সেও কি চুরি করে এ বাগানের ফলটা-মাকড়টা ভেঙে নিয়ে যায়নি ? নিশ্চয় যেছে।

হরিমতী বেন্দার কথা ভেবে সুখে হাসল। বেন্দার কথা ভেবেই মোড়লগিন্নির মুখে শোনা মনা বাউরির সঙের গান বাঁধার কথা মনের ভেতর মুহুর্মুহু ঝিলিক তুলতে থাকল। কী গান বেঁধেছে মনা ? রাধিকার চেয়ে কেষ্ট বয়সে ছোট ছিল বটে। কিংকর বোরেগী এসে বাগানে অনেকদিন পরে খোল বাজাচ্ছে। কেত্তনের এলোমেলো পদ বর্ষার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা কিছু কথা। ছেঁড়াখোড়া বাসি ফুলের মতো কথা। আবেগে দুলতে দুলতে হরিমতী উড়ন্ত কথাগুলোকে ধরতে হাত বাড়াল। পারল না। স্মৃতির ভেতরে তোলপাড় হতে থাকল বোরেগীর ছিলিমের নীল ধোঁয়া বৃন্দাবন কেলিকদম্ব বংশীধ্বনি ললিতা বিশাখা অলসখী। উনুনে ভাত চাপিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হরিমতী সুখের ধারা বইয়ে দিল রাতকানা চোখ দুটোতে।

বেন্দা এসে অবাক হয়ে যাবে গয়না পরা হরিমতীকে দেখে। আমগাছের তলায় কচি ঘাসের চাবড়া বসিয়ে মাটিটা ঠিকঠাক করে ফিরেছে। তাই টের পাবে না কোথায় লুকোনো ছিল এসব জিনিস। রুপোর বিছে আর পায়ের ঝুমঝুমিও পরবে হরিমতী।

মঞ্জু ও তার বর

মঞ্জু তার বরকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তার বরের পরনে ঢোলা পাতলুন, নকসা আঁকা শার্ট, পায়ে গাব্দা জুতো, এবং মাথায় অমিতাভ-বচ্চন চুল। তার সরু গোঁফ আছে। সে মহকুমা শহরের খন্দব্যবসায়ীর ছেলে। বিদ্যায় মঞ্জুর সামান্য ওপরে। শ্বশুর বাড়ি এসে খালি পালাই-পালাই করে। তবে মঞ্জুকে তার এত পছন্দ যে মঞ্জু যদি বলে,

ঘোড়া হও, পিঠে চাপি,—সে তক্ষুণি সবার সামনে উপুড় হয়ে হাঁটু ভাঁজে আপত্তি করবে না।

মঞ্জুরও বরকে বেজায় পছন্দ। বরের খাতিরে হিন্দি হিরোইন সাজতে আপত্তি করে না। তার ওপর আছে মায়ের তাগিদ—যে মা পূর্বার মুখে রঙ মাখার নিন্দে করতেন। মঞ্জুকেও গাব্দা জুতো পরিয়ে ছেড়েছে বর। শহরে হাঁটতে যদি বা অসুবিধে হয় না তত, গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় পা বাড়ানোই কঠিন। তবু মঞ্জু পরেছে।

কমলাক্ষ বাড়িতে দুর্গাপুজো দেন। সেই উপলক্ষে জামাই-মেয়েকে এনেছেন। নবমীর বিকেলে ভরা নদীর ধারে বাঁধের ওপর মঞ্জু তার বরকে এটা-সেটা চেনাচ্ছিল। একটা গাছ দেখিয়ে বলছিল, ওতে ব্রহ্মদত্যি থাকে। একটা লোককে দেখিয়ে বলছিল, ওর নাম মনা। জানো? দারুণ সঙের গান বাঁধতে পারে ও? চৈতসংক্রান্তির গাজনের দিন এলে হেসে অস্থির হবে। আর ওই দেখতে পাচ্ছ, যুধোর কুঁড়ে। খরার সময় ইয়া মোটা তরমুজ ফলায়। এবার খরায় পূর্বাদি—সেই গো কলকাতার পূর্বাদি,...

বর বলল, হুঁ। বলো।

মঞ্জু অন্যদিকে মোড় ফেরাল কথার। ...ওই যে বাঁশবনটা দেখছ, ওটা আমাদের। একবার ওখানে একটা অজগর সাপ খেঁকশিয়ালী গিলে খাচ্ছিল।

বর বলল, খালি ফোট্টোয়েন্টি?

বরের হাসিতে চটে মঞ্জু বলল, বাবাকে জিগ্যেস কোরো। বাবা বন্দুকের গুলিতে সাপটা মেরেছিলেন।

বর বলল, বাঘ নেই তোমাদের গাঁয়ে?

মঞ্জু হঠাৎ আনমনা হয়ে বলল, ছিল। তখন আমার জন্ম হয়নি।

কী হল?

মঞ্জু কিছু দেখছে। দেখতে-দেখতে সে নড়ে উঠল।—ব্যস্ ব্যস্! এই, দেখবে এস—দৌড়ে এস!

বরের হাত ধরে টেনে মঞ্জু ধপাস্ ধপাস করে পা ফেলে দৌড়ুনোর চেষ্টা করল। বর অবাক হয়ে বলল, ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

মঞ্জু বলল, চৌকিদার বিরাট মাছ বিঁধিয়েছে। দেখবে এস না—কী মজা!

একটু এগিয়ে নদীর পাড়ে ঝোপের ভেতরে আঙুল তুলে বাঁকা চৌকিদারকে দেখাল মঞ্জু। বাঁকা তগির সুতো আঙুলে জড়িয়ে মাছটা খেলাচ্ছে। কিন্তু ওই যাঃ! মাছটা ছেড়ে গেল! হতাশ বাঁকা এদিক-ওদিক ঘুরে পেছনে বাবুর মেয়ে-জামাইকে দেখে দাঁত বের করে হাসল।

মঞ্জু বলল, পারলে না তো আটকাতে? তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না চৌকিদার!

বাঁকা বলল, মাছটা বড় ছিল বাবুদিদি! বুঝলেন?

মঞ্জু আবার হাঁটতে লাগল বরকে নিয়ে। বলল, এই লোকটা আমাদের গাঁয়ের চৌকিদার। জানো? ওর পেট কেটেছিল হাস-পাতালে? মরেই যেত। বাবা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

বর হেসে বলল, তোমার বাবা ডাক্তারীও জানেন বুঝি?

ভ্যাট্! মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল। বাবা সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে ভর্তি করত নাকি? কিন্তু তার চেয়ে মজার ব্যাপার, শোনো। লোকটাকে তো দেখলে! চুল পেকে গেছে। ওর বউকে দেখলে ভাববে—মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল।

বর বলল, কী?

মঞ্জু বলল, বাবা বলেন বালিকাবধূ। আমার মতো বয়েস! ওকে নিয়ে একটা দারুণ কেলেংকারি হয়েছিল। বলছি শোনো।

মঞ্জু ভাল করে বলার জন্য দাঁড়াল। ওর বর সিগারেট ধরাল তারপর বলল, কী?

মঞ্জু চোখে ঝিলিক তুলে বলল, চৌকিদার তখন হাসপাতালে।

আমাদের ঝি অন্নকে চেনো? অন্নর বোনপো বেন্দা সেই সময় বালিকা বধূর সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়েছিল। বেন্দার গপ্পটা আরও মজার। আগে এই গপ্পটা শোনো। বেন্দা ছিঁচকে চোর। আমাদের বাঁশবন থেকে বাঁশ চুরি করে। কতবার হাতে নাতে ধরেছি। তো বেন্দা করেছে কী, চৌকিদারের বউকে রাত্রিবেলা—

মঞ্জু খি খি করে হাসতে লাগল। তারপর, বউটাতো ভারি চালাক। চৌকিদার হাসপাতালে গেলে মাসীকে এনে রেখেছে। একা থাকবে কী করে? তো বেন্দা দিনের বেলা চৌকিদারের বউয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। তাই ভেবেছে, রাত্তিরে গিয়ে প্রেম করা যাবে চুটিয়ে।

বর আগ্রহ দেখিয়ে বলল, দারুণ গপ্প। তারপর, তারপর?

মঞ্জু গলা চেপে বলল, দাওয়ায় ঘুমাচ্ছে তুজনে। বেন্দা গিয়ে ভুল করে মাসীর ঠ্যাং ধরে টেনেছে। আর মাসীও সাংঘাতিক মেয়ে খপ করে ধরেছে বেন্দা শালাকে।

ফের? এই! ও কী বলছ? বর জিভ কেটে একটা ভংগি করল মঞ্জুর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে কথাটা।

মঞ্জুও জিভ কেটে বলল, হুঁ। তো হয়েছে কী শোনো। চৌকিদারের টর্চটা মাথার কাছে ছিল।

টর্চ?

হুঁ। অঞ্চল অফিস থেকে না কোত্থেকে চৌকিদারকে টর্চ দেয় জানো না? সেই টর্চ। চৌকিদার তো টর্চ নিয়ে হাসপাতালে পেট কাটতে—

বর বাধা দিয়ে বলল, বুঝেছি। তারপর?

মঞ্জু বলল, ভানু—মানে চৌকিদারের বালিকাবধূ টর্চ জ্বেলে দেখে বেন্দা! চেচাঁমেচি শুনে পাড়া জেগে গেল। বেন্দা মাসী বুড়িটার হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে ততক্ষণে। পরদিন ফাঁড়িতে গিয়ে কেস করে এসেছিল। পুলিশের ভয়ে বেন্দা লুকিয়ে বেড়াত। শেষে এক রাত্তিরে বোষ্টুমীকাকীর ঘরে তাকে ধরে ফেলল।

বোষ্টুমীকাকী কে?

তুমি বড্ড ভুলো মন। কেন, অস্টমঙ্গলায় এসেছিলে,—তখন আমাদের বাগানে নিয়ে গেলুম না তোমাকে? সেই যে মেয়েটা!

হুঁ। মনে পড়েছে। বরের কিছু মনে নেই। তবু বলল।

বেন্দা ওকে বিয়ে করেছিল, বলেছিলুম না? মঞ্জু ফের হাসতে লাগল।—বয়সে বেন্দার ডবল।

মঞ্জু বলল, পুলিশ বেন্দাকে ধরে নিয়ে খুব মেরেছিল। শেষে বোষ্টুমীকাকী গয়নাগাঁটি বেচে অনেক টাকা খরচ করে ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। বাবা বলছিলেন, রেপকেস উঠলে ছ-সাত বছর জেল হয়ে যেত।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাবুর বাগানের কাছে চলে এসেছে। মঞ্জু আস্তে বলল, ওই দেখ—বোষ্টুমীকাকী দাওয়ায় বসে রয়েছে। বাবা বলেছেন, আর কিছুদিন যাক্। দেশের হাওয়া বদলালেই বাগান দখল করে ওকে তাড়িয়ে দেবেন। বাগানটা আমাদের কি না। দাদু মালী বসিয়েছিলেন—বোষ্টুমীকাকী সেই মালীর বউ।

মঞ্জু পা বাড়িয়ে ফের বলল, বাবা বাগানটা আমাকে-তোমাকে যৌতুক দেবেন।

বর বলল, বাঃ! দারুণ হবে। মাঝেমাঝে এখানে এসে স্ফূর্তি করব। একটা নৌকো কিনব। নদীতে ঘুরব। বাঃ!

মঞ্জু স্বপ্ন দেখার ভংগিতে বলল, ওই ঘরটা ভেঙে একটা ছোট্ট পাকাঘর বানাতে হবে কিন্তু।

সে আর বলতে? বর উৎসাহ দেখাল। পিকনিক করার উপযুক্ত জায়গা!

মঞ্জু ওর হাত ধরে টানল। চোখে দুষ্টুমি। এই! এস না! বোষ্টুমীকাকীর সাঙ্গ মজা করে যাই!

আগড় ঠেলে ঢুকলে হরিমতী বলল, দূর! দূর! যাঃ যাঃ!

চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছ না আমরা কে? দূর দূর করছ যে বড়?

হরিমতী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে নিচে পা রেখে বসে আছে। হাতে একটা ছোট্ট লাঠি। অপ্রস্তুত হেসে বলল, অই গো! মঞ্জু নাকি? কবে এলে মা? খবর ভাল তো? একা এসেছ না বর এসেছে শুদ্ধু? এস—এস।

মঞ্জু থমকে দাঁড়াল। তুমি কি চোখে দেখতে পাচ্ছ বোষ্টুমীকাকী?

হরিমতী বিকেলের আকাশের দিকে মুখ তুলে একটু হাসল। ... কই গো! আমার চোখ দুটোর মাথা কবে খেয়েছি, জানো না বুঝি?

অন্ধ হয়ে গেছি মা।

সে কী বোষ্টুমীকাকী !

হরিমতী বলল, হঠাৎ ও-মাসে দুপুরবেলা চোখ কটকট করে সে কী যন্তন্না। ক্রিমে ক্রিমে পিথিমী আঁধার হয়ে গেল। কত চিকিচ্ছে করালুম, আর চোখ ফিরে পেলুম না মা !

মঞ্জু বলল, বেন্দা তোমার কাছে থাকে তো বোষ্টুমীকাকী ?

অন্ধ হরিমতী হাসল।...থাকে বৈকি মা। যাবে কোথা ?

মঞ্জু ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, বেন্দা কোথায় বোষ্টুমীকাকী ?

হরিমতী লাঠিটার মাথার দিকটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে হাতে চিবুক রেখে আস্তে বলল, হরিমোড়লের পাট কাচতে গেছে দোহালিয়া বিলে। জোসনা উঠবে তো ? অনেকটা রাত অব্দি এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাট কাচবে। সকাল থেকে দুপুরঅব্দি ধানজমিতে নিড়ান দিয়েছে। বারণ করলুম, অত খেটে মারা পড়বে যে ! শুনল না। পাট কাচতে গেল। তো বিলের জলে বাবু বড্ড জোঁকের উৎপাত।

মঞ্জু হঠাৎ হাসল। দেখো বোষ্টুমী, বেন্দাশালা শেষপর্যন্ত তোমাকে ফেলে পালায় না যেন।

বলেই ঘুরল। ওর বরের খারাপ লাগছিল। এগিয়ে গিয়ে আগড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নদী দেখছিল। মঞ্জু ফের বলল যেতে যেতে, চলি বোষ্টুমীকাকী !

হরিমতী আগের কথাটার জবাবে একটু হেসে বলল, পালিয়ে গেলে যাবে। বাগানটুকুন রেজেস্টারি করে দেব ভেবেছি আজকালের মধ্যে। চলে গেলে পাবে না।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু চাপা গলায় বলে উঠল, তোমার চৌদ্দপুরুষের বাগান। থামো, বলছি বাবাকে গিয়ে। রেজেস্টারি বের করে দিচ্ছে !....

বাবুর বাগানে জ্যোৎস্না

শরৎকালের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে বাবুর বাগান। বেন্দা এসে দেখল, হরিমতী দাওয়ায় তেমনি বসে আছে। মশা মারছে চটপট শব্দে।

বেন্দা বলল, হেরিকেনটা রেখে গেলুম পিঠের কাছে। দেশলাই পর্যন্ত। জ্বালতে পারো নি ?

হরিমতী বলল, কী হবে ঘামোকা তেল পুড়িয়ে ? আক্রা তেল !

বেন্দা রাগ করে বলল, আক্রা-শস্তা আমি বুঝব। তোমার কী ?

একটু পরে সে হেরিকেন জ্বেলে দাওয়ার কোনায় শিকেয় ঝোলানো ভাত-তরকারীর হাঁড়ি নামায়। তুটো টিনের থালায় ভাগাভাগি করে নিয়ে ডাকল, এস। ভাত খাই।

হরিমতী বলল, তুমি খাও। আমি খাচ্ছি।

বেন্দা এসে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল। বলল, তোমার কী হয়েছে বলোদিকিনি ?

হরিমতী বলল, কিছু হয় নি।

বেন্দা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল।···চোখ গেছে তো কী হয়েছে ? রাগ করে থাকলে দিষ্টি আসবে ? খাও।

সে থালাটা ঠেলে হরিমতীর হাতে ঠেকিয়ে দিল ! হরিমতী অগত্যা বলল, হাত ধোব জল দাও।

জল গড়িয়ে দিল বেন্দা। হাত ধুয়ে হরিমতী মুখে ভাত তুলল। বেন্দা হাসতে হাসতে বলল, খাইয়ে দিতেও পারি। তুমি কতসময় আমাকে খাইয়ে দিয়েছ না ?

ভাত খেতে-খেতে বেন্দা মাঠঘাটের গল্প করতে থাকল। তারপর বলল, শালা কী জোঁক হয়েছে মাইরি ! একপো রক্ত শেষ করেছে। কেরাচিন মেখে গেলুম অতটা। তবু গেরাহ্যি করলে না, চিনচিন করছে এখনও।

হরিমতী বলল, সর্ষের তেল মালিশ করে দোব।

হাঁড়িকুঁড়ি ঘরকন্না সামলে বিড়ি জ্বালল বেন্দা। হরিমতীর মুখেও গুঁজে দিল। তারপর বলল, হরিমোড়লকে বললুম জানো ? বাবু খুব শাসাচ্ছে উচ্ছেদ করবে বলে। মোড়ল বললে, আমরা আছি না মরে গেছি ? বাবু অন্যায় করবে আর গাঁয়ের লোকেরা বসে-বসে দেখব ? আইন নেই ? গরমেণ্টো নেই ?

হরিমতী চুপ করে রইল।

বড্ড মশা হয়েছে। তাই তাপ্পিদেওয়া মশারিটা খাটিয়ে শুতে হয়। হাওয়াবাতাস বন্ধ। গরম পড়েছে আবার। দাওয়ায় মশারির ভেতর উপুড় হয়ে শুয়েছে বেন্দা। হরিমতী তেল মালিশ করে দিচ্ছে। বেন্দা আরামে চুপ করে আছে।

কতক্ষণ পরে হরিমতী তার মুখের কাছে ঝুঁকে ডাকল ঘুমুলে ?

উঁ ?

একটা কথা বলব ?

বেন্দার ঘুম পাচ্ছিল। বলল, কী ?

তোমাকে বাগান রেজিষ্টরি করে দেব। তুমি পালিয়ে যাবে না তো আমাকে ফেলে ?

ঘুম চটে গেল বেন্দার। ঘুরে চিত হয়ে বলল, পালিয়ে যাব ? তুমি বড্ড নেমকহারাম মেয়ে মাইরি। ধ্যাৎ !

হরিমতী ওর বুকে মুখ গুজে বলল, আমি অন্ধ হয়ে গেলুম। তুমি চলে গেলে আমার বড় কষ্ট হবে।

বেন্দা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তোমার মাইরি খালি ওই কথা ! দেখ হরিমতী, সেই যে তোমাকে নদীর তলা থেকে একরকম কুড়িয়ে আনলুম—তুমি আমার পায়ে কেরাচিন মালিশ করে দিলে, তখন থেকে তুমি আমার মাও বটে, বউও বটে। হ্যাঁ— আমি জানি, আমার মা বলতেও তুমি, বউ বলতেও তুমি। আর ই সংসারে আমার আছেটা কে ? শোওদিনি চুপচাপ। ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

হরিমতীকে সে জোর করে শুইয়ে দিল্। ফের বলল, তুমি যদ্দিন বাঁচবে, বাবুর বাগান ছেড়ে কোথাও যেয়ে শান্তি পাবে না বেন্দা।

অন্ধ হরিমতীর বুকে মুখ গুজে বেন্দা শুয়ে রইল। হরিমতী তার পিঠে হাত বুলোতে থাকল। বাবুর বাগানে জ্যোৎস্নায় পোকামাকড় ডাকতে থাকল।

॥ নন্দন কানন ॥

যোগেশ্বর সেদিন বিকেলে তাঁর কলকাতার নাতনী শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুনোর কয়েক মিনিট পরে বাড়িতে চোর ঢুকল।

চোরের সংখ্যা দুই। একজনের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বছর। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বেঁটে-খাটো, ঈষৎ নাদুসনুদুস গড়ন। চোখ দুটো সব সময় চঞ্চল এবং চোখের তারা পিঙ্গল বর্ণ। মাথার চুল খুঁটিয়ে কামানো। পরনে ঢোল খাঁকি হাফপেণ্টুল, পায়ে কালো ক্যাম্বিশের জুতো। গায়ে ছাইরঙা স্পোর্টস গেঞ্জি। কাঁধে বড়সড় একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। আর ডান হাতে একটা ছোট্ট সরু লোহার শিক। ওই দিয়ে অনেক জটিল তালা সে খুলেছে এ যাবৎ।

দ্বিতীয় চোর বয়সে নবীন। পঁচিশ বছরের বেশি নয়। তার পরনে একদা-জনপ্রিয় নর্দমা-পাতলুন। পায়ে জুতো-টুতো নেই। গায়ে ময়লা বাদামী হাফশার্ট। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল. সে বেজায় রোগা। একটু কুঁজো হয়ে হাটে। মুখখানা ডিমালো, ভারি অমায়িক। তার কান দুটোও একটু লম্বাটে। চোখ দুটো ছোট্ট, কুতকুতে। গর্তে বসা। তলায় কালচে ছোপ। কিন্তু ফিক করে হাসলে তাকে ভারি ভালমানুষ দেখায়। তার কাঁধে একটা কালো-রঙের কিটব্যাগ রয়েছে। পলিথিনের এই ব্যাগটা সে নিশ্চয় পয়সা খরচ করে কেনে নি।

যোগেশ্বরের বাড়ির দিকে এই দুই চোরের অনেক দিনের নজর ছিল। এমন কী প্রৌঢ় চোরটি একবার তাঁর কাছে চাকর-বাকরের কাজও চেয়েছিল। যোগেশ্বর কড়ামুখে বলেছিলেন, দরকার নেই। তিনি তত আরামপ্রিয় মানুষ নন। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি বেশিরভাগ কাজ নিজের হাতে করে থাকেন। শুধু রান্নার জন্যে

অনেক বছর ধরে ভগু নামে কটক জেলার এক নিরীহ ও বিনীত বামুন ঠাকুর রেখেছেন। এসব কারণে এক নম্বর চোর কোনো সুবিধে করতে পারেনি।

গত তিনদিন এবং প্রায় তিনরাত্তির দুই চোর মরীয়া হয়ে একটানা বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছে। যোগেশ্বর বাড়ি থেকে কদাচিৎ বের হন। বের হলে সজাগ ভগু তো থাকেই। সে শুধু ঠাকুর-কাম-চাকর নয়, মালীও বটে। যোগেশ্বরের বাড়ি ঘিরে প্রায় একটা নন্দন কানন রয়েছে। রঙবেরঙের দিশি বিদিশি ফুলের গাছ, লতাঝোপ, গাছপালা কতরকম। যোগেশ্বরের এই একটা প্রচণ্ড নেশা। বছর দশেক আগে পুলিসের চাকরি থেকে রিটায়ার করার কিছুদিন পরেই গিন্নি স্বর্গগতা হন। একটি মোটে ছেলে। সেও পুলিসে ঢুকে বড় অফিসার হয়েছে। কলকাতার লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে আছে। যোগেশ্বর এই মফস্বল শহরের একটেরে নদীর ধারে নিরালায় বাড়িটা বানিয়েছিলেন। তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন বলতে এটুকুই ছিল।

গতকাল বিকেলে যোগেশ্বর তাঁর গাড়ি নিয়ে একবার বেরিয়েছিলেন। তখন দুই চোর বাড়ির পিছনে নদীর পাড়ে ঝোপের ভেতর বসে ধূর্ত শেয়ালের মতো উঁকি মারছিল। কিন্তু ভগুকে বাড়ি ঘিরে সতর্ক এ্যালসেশিয়ানের মতো ঘুরপাক খেতে দেখে চোরদ্বয় বুঝেছিল, এটাই কর্তাবাবুর নির্দেশ এবং ভগুর গায়ে জোর না থাকলেও গলার জোরের কথা তাদের জানা। এমন রামচ্যাঁচানি চেঁচাতে এ শহরে ভগুর জুড়ি নেই।

চোরদ্বয় তবু আশায় ছিল। কিন্তু মিনিট দশেক পরেই যোগেশ্বর ফিরে আসেন। সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতী। তাকে দুই চোর অনেকবার দেখেছে। জানে, ও হচ্ছে লালবাজারের ধুরন্ধর এক গোয়েন্দা অফিসারের মেয়ে। ওর নামটাও তাদের অজানা নয়। যোগেশ্বর তাহলে নাতনিকে আনতে রেলস্টেশনে গিয়েছিলেন। এই নাতনিটি বড় চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে।

স্বভাবত চোরেরা বড্ড মুষড়ে পড়েছিল। তবু আশা ছাড়েনি। সেই আশা পরদিন বিকেলে আশ্চর্য সৌভাগ্যে সফল হয়ে গেল। যোগেশ্বর নাতনিকে নিয়ে বেরুতেই এক অভাবিত ঘটনা ঘটল, যা চোরদ্বয় কোনো দিন ভাবেনি। ভগুর রকম সকম এতদিন পর্যবেক্ষণ করেও আঁচ করতে পারেনি যে এমন নিরীহ বয়সী লোকের একজন প্রেমিকা থাকতে পারে।

প্রেমিকাটি আর কেউ নয়, রঘুনাথ উকিলের বাড়ির ঝি—যাকে সবাই বলে পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা-ও হয়তো কোথাও ওৎ পেতে ছিল। তাকে রাস্তায় যেই দেখা, ভগু ঠাকুর লাজুক হেসে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে কাছে চলে গেল। হ্যাঁ, তালা এঁটেই গেল সে। একটু পরেই দুজনে সিঙ্গিদের আম বাগানের ভেতর দিয়ে পোড়ো ইঁটভাটার জঙ্গলে ঢুকতেই দুই চোর পিছলে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। নদীর দিকের গেট অনায়াসে খুলে বাগিচায় ঢুকল। তারপর পিছনের বারান্দার দাঁড়িয়ে ঝটপট চারদিক দেখে নিয়ে অপূর্ব কারিগরি কৌশলে জানলার ফাঁকে শিক গলিয়ে ছিটকিনি তুলল।

প্রৌঢ় চোর ফিসফিস করে বলল, ভুতো! সামনে যা বাবা।

যুবক চোর বলিল, গতিক বুঝলে কেসে দেব মামা!

দুবার কাসিস। বলে প্রৌঢ় চোর ব্যাগ থেকে লোহাকাটা যন্তর বের করল। যুবক চোর ভুতো সাঁৎ করে বাড়ির পেছন ঘুরে গিয়ে কোণার দিকে দেয়ালে পাইপের পাশে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। সে কলের পুতুলের মতো একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দৃষ্টি ফেলতে থাকল। ওদিক থেকে তখন চাপা কটর কটর ঘস্ ঘস্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তারপর এপাশের একটা দরজা খুলে মামা চোর উঁকি মেরে ডাকল, চলে আয় ভুতো! অনেক মাল। একা নেওয়া যাবে না। উদ্বিগ্ন মুখে ভাগ্নে চোর ভুতো বলল, ঘাঁটি আগলাবে কে মামা? যদি ভগা ফিরে আসে?

মামা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, চলে আয় বলছি হতভাগা।

ধমক খেয়ে ভাগ্নে ঘরে ঢুকল। এই ঘরেই উদ্দিষ্ট মাল রয়েছে। সেই কবে যখন মামা চোর পুরানো খবরের কাগজ কিনে বেড়াত, তখন দেখে গিয়েছিল। কাচের আলমারিতে সাজানো কয়েকটা রূপোর বাসন আর অনেকগুলো ব্রোঞ্জ ও পিতলের মূর্তি—সেগুলো শিল্পদ্রব্য। নানা জায়গা থেকে এসব জিনিস সংগ্রহ করা এক সময় বাতিক ছিল যোগেশ্বরের। একটা আলমারিতে সেকেলে কাঁসার তৈজসও রয়েছে। দুই চোরের থলি প্রায় ভর্তি হয়ে গেল।

তারপর দুজনে ঢুকল ড্রয়িং রুমে। যোগেশ্বর যৌবনে নামকরা খেলোয়াড়ও ছিলেন। অনেক সোনা রূপোর পদক এবং হরেকরকমের ট্রফি পেয়েছিলেন। সেগুলো অতিথিদের চোখে পড়ার মতো করে সাজানো হয়েছিল। দুই চোর লুঠেপুঠে ব্যাগে ঠেসে ভরল সব।

ভুতো বলল, মামা, সোনার ঠাকুর নেই?

মামা চোখ পাকিয়ে বলল, থাম্ বাপু। আর কী আছে, দেখতে দে।

আলো জ্বালি মামা। অন্ধকার যে!

খবর্দার! মামা ধমকাল! তুই এবার ঘাঁটিতে যা। দুবার কাসবি কিছু দেখলে।

ভাগ্নে বেরিয়ে গেল। ভারটা তার পক্ষে একটু বেশি হয়েছে। কুঁজো গতর আরও কুঁজো হয়ে গেছে। পা ফেলতে পা টলছে। গায়ে তত জোর নেই। এ বয়সে তিন বেলা পেটপুরে ভাল রকমের খাবারটা জোটে না বলেই এ অবস্থা। সে ভাবছিল, এখন দৌড়তে হলে কেলেঙ্কারি হবে। সেবারকার মতো রামপ্যাঁদানি বরাতে জুটলে আর মামা বলে ডাকবার সময় পাবে না। করুণ মুখে সে দেয়ালের পাইপ ঘেঁষে ধুপ করে বসে পড়ল। দাঁড়ালে লোকের চোখে পড়ার ভয়টা এখন তাকে পেয়ে বসেছে।

যোগেশ্বর সেবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুলিসী কৃতিত্বের দরুন একটা সুন্দর তাম্রফলক উপহার

পেয়েছিলেন। ফলকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বই থেকে নেওয়া দু লাইন শ্লোক খোদাই করা আছে। যোগেশ্বরের বড় আদরের বস্তু এটি। যখন-তখন একবার করে সামনে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর স্বরে শ্লোকটি পাঠ করেন। ভাবগদগদ হয়ে ওঠেন। এসময় ভগু ঠাকুর কাছাকাছি থাকলে সেও করযোড়ে প্রণাম করে বসে। ভাবে, না জানি কোন দেবতার নিদর্শন।

মামা চোর ফলকটা দেখতে পেত না, যদি না এ ঘরের জানলার ফাটল দিয়ে নদীর ওপারের টাল খাওয়া সূর্যের ক্ষীণ একফালি সূচের মতো আলো এসে সোজা ওটার গায়ে পড়ত!

সে হাত বাড়িয়ে সেটা ফাউয়ের মতো গ্রহণ করল। তারপর বেরিয়ে গেল। দরজা ভেজিয়ে দিতে ভুলল না।

তখনও ভগুর পাত্তা নেই! দুই চোর যেদিক থেকে ঢুকেছিল, সেই দিকেই বেরুল। নদীর ঢালু পাড়ে ঘন ঝোপ জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। সূর্য ওপারের বাঁশবনের ভেতর সবে নেমেছে। মাথার ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এক ঝাঁক কাক চলে গেল। ওপাশে খেলার মাঠের দিকে একটা গাধা লম্বা ডাক ছাড়ল। দুই চোর জলের ধারে গিয়ে শহরের দিকটা দেখে নিল। তারপর উল্টো-দিকে হাঁটতে থাকল খুব সাবধানে পা ফেলে! ঢালু মাটিতে জলের ধার ঘেঁষে ঘন ঘাস গজিয়েছে! কিন্তু তলার দিকে বালি। ধসে গিয়ে অগাধ জলে পড়লে কেলেংকারি হবে।

এদিকে কোন বসতি নেই। মাইলটাক শুধু ভুঁই ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালা। তারপর জেলে বসতি আছে একটা। ভাগ্নে বুঝতে পারছিল না মামা কোথায় চলেছে। কিট ব্যাগটা বেশ ভারি হয়েছে তার পক্ষে। জেলে বসতি সামনে উঁচু পাড়ের ওপর। নিচে নদীতে কয়েকটা ছোট্ট নৌকো দেখা যাচ্ছে শেষ বেলার ধূসর আলোয়। ঘাটে একটা মেয়ে আপন মনে কাপড় কাচছে অবেলায়। দুটো ন্যাংটো ছেলেমেয়ে আর একটা নেড়ি কুকুর ঘাটের মাথায় খেলায়

মেতে আছে। মামা চোর বলল, হুঁ। এখানে বসা যাক্ বাবা। আয়, এবার ধুঁয়ো টানি। জিরিয়ে নিই খানিক।

ঝোপের ভেতর একখানে ফাঁকা একটু জায়গায় নরম দূর্বা গজিয়েছে। চৈত্রের মাঝামাঝি সময় এখন। গরম দিনে দিনে বাড়ছে। তবে নদীর বুকে হু হু হাওয়া দিচ্ছে বলে সেটা টের পাওয়া যায় না। ঝোপঝাড়ে কোথাও কোথাও বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ মউমউ করছে। জিরিয়ে নিতে ফুসরৎ পেয়ে এবং বিড়ি টানার আনন্দে ভুতো নাক উঁচু করে শুঁকে বলল, গন্ধটা বেশ মামা! দারোগাবাবুর বাগানে তখন কেমন গন্ধ পাচ্ছিলুম এ গন্ধটা তার চেয়ে ভালো।

মামা বিড়ি জ্বেলে সস্নেহে বলল, দারোগাবাবু কী রে? যখন ছিল, তখন ছিল। এখন অস্টরম্ভা। ঢোঁড়া সাপ।

ভুতো ওই বিড়িরই ভাগ পাবে। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে দেখছিল মামার টান। হাতের আড়ালেই টানছে মামা। ভুতো দাঁত বের করে বলল, মামা!

কী রে?

আমরা কোথায় যাচ্ছি গো?

মামা রহস্যময় হাসল: সে এক নিরিবিলি জায়গা। গিয়ে দেখবি' খন।

ভুতো একটু চুপ করে থেকে ফের দাঁত বের করল। ও মামা! অনেক দূর বুঝি?

হুঁ। একটু দূর বই কি! মাইল সাত-আটেকের কম নয়।

ভুতো আঁতকে উঠল।...ওরে বাবা। অতদূর?

মামা ভাগ্নের হাতে জ্বলন্ত বিড়িটা দিয়ে নরম গলায় বলল, ভাবছিস কেন? ওই দেখ্ নৌকো, আমরা একটা নৌকো নেব। একটুখানি অপেক্ষা কর না।

ভুতো চোঁ চোঁ করে কয়েক টানে বিড়ির সুতো পার করে দিল। তারপর ধোঁয়া ভরা গলার ভেতর থেকে বলল, নাও।

মামা ফোঁক ফোঁক শব্দে শেষ সুখ টান টেনে হাসল।···আর নেই কিছু। বরাত খুললে অবশ্যি দেখবি, আমরা সিগারেট খাব। তা'পরে জানিস ভুতো? বহু দিনের ইচ্ছে, একটা মেকানিকসের দোকান খুলি। রাধুবাবুর গ্যারেজ ঘরটা দেখেছিস্ তো? খালি পড়ে আছে। পঁচিশ টাকা ভাড়া চায়। শালা কেপ্পনের ধাড়ী! দেখা যাক্। অনেক যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে, বুঝলি ভুতো?

ভুতো সায় দিয়ে বলল, তা তো হবেই!

পা ছড়িয়ে আরামে চোখ বুজে মামা বলল, সাইকেল রিকশোই সারব বেশি। তার ফাঁকে দু-একটা সাইকেল। তুই সঙ্গে থাকলে আমাকে আটকায় কে? তুইও তো বাপু নিষ্কর্মা নোস। এসব কাজ ভালই জানিস।

জানি। ভুতো হাসল। রজব আলির শিক্ষা, মামা। তবে শালা কথায় কথায় ঠেঙাত। নৈলে লোকটা পাকা মিস্তিরি ছিল, মামা।

মামা বলল, আর আমার বরাতটা দেখ্ ভুতো। চিরটা কাল এঘাটে ওঘাটে হন্যে হয়ে ঘুরলুম। কত কাজ না শিখলুম। অথচ 'পারমানেন্' হয়ে বসতে পারলুম না কোথাও। জানিস, কলকাতায় চিৎপুরে বছর খানেক হারমোনিয়াম সারাতুম। মালিক শালা এক মাল মাইরি! খামোকা চোরের বদনাম দিয়ে পুলিসে দিলে! জেল পর্যন্ত খাটালে।

তুমি জেল খেটেছ মামা? ভুতো চাপা গলায় বলে উঠল। জেল কেমন জায়গা গো?

যাবি নাকি? খিকখিক করে হাসতে থাকল মামা। জেল জায়গাটা মন্দ নয়, বুঝলি? তবে বড্ড একঘেয়ে লাগে। আর শালা যত সব হারামজাদা দাগীরা পা টেপায়!

কী খেতে দেয় গো?

খেঁচুড়ি। কখনও দুমুঠো কাঁকর মেশানো মোটা চালের ভাত। ফ্যানসুদ্ধ।

তরকারি দেয় না?

একটুখানি ঘ্যাঁট দেয়। আলুনো। তবে ঘড়ির টাইম মতো খাওয়া

তো। আমার হেলথ্‌টা ভালই হয়েছিল রে ভুতো। গায়ে অনেক মাস ধরেছিল।

আমি জেলে গেলে খুব মোটা হয়ে যাব—তোমার মতো।

ভুতো হাসতে লাগল হি হি করে। মামা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওপরে পাড়ের দিকে তীব্র আলো ঝলসে উঠল। আলোটা নদীর জলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর নিভে গেল।

দুজনেই মাটিতে উবুড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর মামা ফিসফিস করে বলল, মোটর গাড়ি রে ভুতো। নড়িস না। দেখতে পাবে।······

যোগেশ্বর গাড়ি থেকে নেমে বললেন, শমু! এই হচ্ছে ম্যাকফারসান সাহেবের কুঠিবাড়ি, নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে এখানেই ছিল ডিস্ট্রিক্টের সেরা সিল্কসেণ্টার। তখন গঙ্গায় জাহাজ চলত। ওই দেখছ, ভাঙা গেট মতো জায়গা আর সিঁড়ি। ওটাই ছিল জাহাজ ঘাটা। চলো, ওখানটা দেখিয়ে আনি তোমাকে। পাশেই সায়েবের কবর আছে।

শর্মিষ্ঠা বলল, কুঠিবাড়ি বললে। কিন্তু কোথায় কুঠিবাড়ি? খালি তো জঙ্গল।

যোগেশ্বর হাসলেন।···এখন জঙ্গল। একশো বছর আগে এখানেই ছিল বিশাল এক প্রাসাদ। গঙ্গার ধারে ধারে যে রাস্তায় আমরা এলুম, ছেলেবেলায় তার অন্য চেহারা দেখেছি। এখন হাইওয়ে হয়েছে। তখন আমাদের শহর থেকে এই সিল্কসেণ্টার অব্দি রাস্তার দুধারে ছিল কত সুন্দর-সুন্দর পাম গাছ। এখন শুধু মেহগিনি আর আকাশিয়া টিঁকে আছে কয়েকটা। এস।

থাক্‌ গে। আমার ভয় করছে।

সে কী! যোগেশ্বর হা হা করে হেসে উঠলেন। ভূতের ভয়?

শর্মিষ্ঠা বলল, যাঃ! ভূত আমি মানিনে। সাপটাপ······

কথা কেড়ে যোগেশ্বর বললেন, দ্যাটস ট্রু। তবে আমি কি তৈরি হয়ে বেরুইনি ভাবছ? বলে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে

জ্বাললেন। নির্ভয়ে চলে এস। তোমাকে ঘাটটা দেখাতে চাইছি, তার কারণ তুমি পত্তটত্ত লেখ। এক অপূর্ব—ওয়াণ্ডারফুল বিউটি স্পট শমু! মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তবে সবচেয়ে সুন্দর লাগে জ্যোৎস্না রাত্রে। কিন্তু আমার ওই প্রব্লেম, ভগুটা বড্ড বোকা। আজকাল যা চোরচোট্টার উপদ্রব বেড়েছে কহতব্য নয়। বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেশিক্ষণ কাটানো যায় না।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে গিয়ে ভাঙা গেটের ওধারে সেকালের সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুলেন। তারপর যোগেশ্বর নিচে এদিকে ওদিকে আলো ফেলছিলেন। হঠাৎ শর্মিষ্ঠা চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, ও কী? ওটা কী?

দাছকে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল। এমন বেমক্কা জড়িয়ে ধরা যে যোগেশ্বর টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। নৈলে ভাঙা শ্যাওলা ধরা পাথরের ধাপ গড়িয়ে সোজা নদীতে গিয়ে পড়তেন।

যোগেশ্বর নাতনির আচরণে ধাঁধায় পড়ে গিয়ে বেমক্কা গর্জন করে বললেন, কোন ব্যাটা রে? কে তুই? গুলি করে মারব ব্যাটাচ্ছেলেকে!

তাতেও রাগ পড়ল না। নদীর দিকে মুখ করে জ্বলন্ত টর্চ পিস্তলের ভংগিতে বাগিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, কথা বলছিস নে যে? তবে রে স্কাউণ্ড্রেল!

শর্মিষ্ঠা বলল, আঃ! ওদিকে কোথায়? এদিকে-এদিকে।

সে বাঁপাশে নিচের ঝোপঝাড়ের দিকটা দেখাল। তখন যোগেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে সেদিকটায় আলো ফেললেন। ছোট্ট টর্চের আলো বেশি-দূর পৌঁছল না। কিন্তু ততক্ষণে যোগেশ্বর টের পেয়েছেন। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন নাতনির কথায়।

একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, কৈ, কাকেও তো দেখছি না। তুমি কী দেখেছিলে বলো তো?

উদ্বিগ্ন শর্মিষ্ঠা বলল, কী যেন দেখলুম নড়াচড়া করছিল।

যোগেশ্বর এবার হা হা করে হেসে ফেললেন।...চোখের ভুল, স্রেফ

চোখের ভুল! তোমরা কলকাতার মানুষ কিনা। সব সময় আলোর মধ্যে কাটাও। তাই……

শর্মিষ্ঠা বলল, ভ্যাট্! বড্ড লোডশেডিং!

যোগেশ্বর বললেন, তাহলেও এমন জঙ্গুলে জায়গায় তো ঘোরো না। অন্ধকারে ভুল দেখেছ। হ্যালুমিনেশান!

শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়ে বলল, অন্ধকারে ঘুরতে ভাল লাগে না চলো, ফেরা যাক্। অনেকদিন পরে যোগেশ্বর নাতনিকে নিয়ে বেড়ানোর সুবাদে খোলামেলায় ঘোরার পুরানো আনন্দ অনুভব করছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ির দিকে ফিরতে হল। একসময় গ্রামাঞ্চলের থানায় দাপটে দারোগাগিরি করেছেন। অন্ধকার রাতবিরেতে ঘোরার অভ্যাস ছিল। পরে প্রমোশন পেতে-পেতে যখন উঁচুপদে ওঠেন, তখনও সেই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা কাটেনি মন থেকে। চুপচাপ বাড়ি বসে দিন কাটানো তাঁর মতো মানুষের পক্ষে কষ্টকর। অগত্যা বাগান করার নেশায় মেতে ওঠেন। কিন্তু এখনও গা ছমছম করা অন্ধকার রাতবিরেতে তাঁর অকারণ বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। পারেন না। দিনে দিনে চোরচোট্টার উপদ্রব যা বাড়ছে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে রাস্তায় পৌছে বললেন, মন্দ এ্যাডভেঞ্চার হল না। কী বলো শমু? ফিরে গিয়ে গল্প করবে সবার কাছে, ম্যাকফার্সনের জাহাজ ঘাটায় ভূত দেখেছিলে!

শর্মিষ্ঠা জোরে মাথা নেড়ে বলল, ভ্যাট্! ভূত আমি মানিনে

কিন্তু একটা কিছু দেখেছিলে তো?

কে জানে!…একটু চুপ করে থাকার পর শর্মিষ্ঠা ফের বলল, শোনো দাদু। তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

যোগেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, খুব করি।

কখনও দেখেছ?

হুঁউ।

কোথায় দেখেছ বলো না।

যোগেশ্বর সাবধানে গাড়ি চালান। পুরনো মডেলের গাড়ি। কিন্তু

বিগড়োয় কদাচিৎ। এখানে হাইওয়ে ঘুরে রেললাইন পেরিয়ে গেছে। ওঁরা ডাইনে ঘুরে শহরের দিকে এগোলেন।

শর্মিষ্ঠা ফের বলল, কই বলো, কোথায় দেখেছ ভূত?

যোগেশ্বর বললেন, খাওয়ার টেবিলে বলব'খন।

শর্মিষ্ঠা জেদ ধরে বলল, না। এক্ষুনি বলো।

যোগেশ্বর জানেন তাঁর এই নাতনিটি বড় একরোখা মেয়ে। কিন্তু এটা একটা বেয়াড়া রাস্তা। শহরের এদিকটায় খেলার মাঠ, ইঁটভাঙা, কাঠগোলা রয়েছে। তাই রাস্তা যদিও নিরিবিলি, ওপাশে ধোপাবস্তি থেকে অনেক সময় দু-একটা গাধা এবং মুদ্দোফরাসবস্তি থেকে আচমকা শুওরের পাল এসে পড়ে। দুধারে ঝোপঝাড় বলে বোঝা যায় না, কখন ওরা ঝোপ ফুঁড়ে রাস্তা পেরুতে আবির্ভূত হবে। একবার একটা গাধা তাঁকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল। গাড়ি ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারে আর কী! আর একবার এক পাল শুওরের মধ্যে পড়ে খুব ভুগেছিলেন। একটা ধাড়ী শুওরের ঠ্যাং খোঁড়া করে দশটা টাকা গচ্চা গিয়েছিল। আজকাল লোকেদের হালচাল অন্যরকম। কথায়-কথায় দলবেঁধে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলো ওত পেতেই আছে এ মফস্বল শহরে। সুযোগ পেলেই এগিয়ে এসে মাথায় ছাতা ধরে। যোগেশ্বর রাজনীতিওয়ালাদের বেজায় ভয় পান।

কিন্তু নাতনির মন না রাখলেও বিপদ ঘটতে পারে। গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে বললেন, সেবার এই পৈতৃক শহরে বদলি হয়ে এসেছি। বছর দশেক আগের কথা। এখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে একটা পুরানো বাগান বাড়ি আছে। ফরাসডাঙ্গা জায়গাটার নাম। কাছাকাছি বসতি বলতে কিছু নেই। গঙ্গার ধারে পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বাগান আর মস্তো দোতলা বাড়ি। আমাদের পুলিসের ইনফর্মার থাকে জানো তো? তার কাছেই খবর পাওয়া গেল, সেদিন রাতে ওই পোড়ো বাগান বাড়িতে একদল ডাকাত জড়ো হবে। তারা নাকি হরিণমারা নামে একটা গাঁয়ে ডাকাতি করতে যাবে। যার বাড়ি ডাকাতি করবে, সে একজন বড়লোক জোতদার। তো খবর পেয়েই একদল কনস্টেবল

আর অফিসার পাঠিয়ে দিলুম হরিণমারায়। আর আমি চললুম জনা দশেকের পার্টি নিয়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। বাগান বাড়িটা ঘিরে ফেললুম। বন্দুক পিস্তল টর্চ লাঠি-সোটা—আমরা একেবারে তৈরী হয়েই গেছি।

চুপ করতে দেখে শর্মিষ্ঠা বলল, তারপর?

ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে উত্তেজিত ভাবে যোগেশ্বর বললেন, দেখ, দেখ! কী আপদ!

শর্মিষ্ঠা বলল, কী দাদু? সে ভয় পেয়ে দাদুর কাছ ঘেঁষে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে।

যোগেশ্বরের মুখে শক্ত ভাব। ফর্সা কামানো গাল ঠেলে সার সার চোয়ালের দাঁতের আভাস। দাঁত কড়মড় করছেন বোঝা যায়। মস্তো গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপছে।

একদল শুওর ঝোপ ফুঁড়ে বেরিয়ে ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত করে রাস্তা পেরুচ্ছিল। জল কাদায় নোংরা তাদের শরীর। একটা ধাড়ী শুওর হঠাৎ থেমে গাড়ির সামনেটা শুঁকে গেল।

যোগেশ্বর মুখ বাড়িয়ে বললেন, দেখছ, দেখছ ব্যাটাদের স্পর্ধা?

শুওরের দলটা চলে গেলে গাড়ি স্টার্ট দিলেন। শর্মিষ্ঠা বলল, হুঁ, ভূতের গল্পটা।

মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে. সামলে নিয়ে যোগেশ্বর বললেন, ফরাসডাঙ্গার বাগান বাড়িটা একশো বছর আগে বানিয়েছিলেন পূর্ণিয়ার এক জমিদার। ওই সময় জমিদারী আর নেই। সে জমিদারও কবে মারা গেছেন। বংশধরদের মধ্যে মামলা বেধেছে তাই বাড়িটার অমন দুর্দশা।

বিরক্ত শর্মিষ্ঠা বলল, আহা, ভূত দেখার কথাটা বলো।

বলি। যোগেশ্বর এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে গোঁফ পাকিয়ে নিলেন! ঠোঁটে মুচকি হাসি।...তো বাগানবাড়ি একেবারে নিশুতি। ভাবলুম, ইনফর্মার ভুল খবর দিলে? নাকি ব্যাটারা একটা কিছু আঁচ করে কেটে পড়েছে? টর্চ জ্বেলে বুঝে নিলুম অবস্থাটা।

গুলি বা বোমা ছুঁড়বে বলে ভয় ছিল। কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। তখন একজন সাব-ইন্সপেক্টার আর দুজন সেপাই নিয়ে ভাঙা জানলা গলিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বড় বড় সব ঘর। দরজা জানলা ভাঙা। এঘর ওঘর ঘুরে হলঘরে গেলুম। সেখানে দোতালায় ওঠার চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের। ছেঁড়াখোঁড়া কার্পেট পাতা রয়েছে কোথাও কোথাও। দিনের বেলা যে লোকটা দেখাশোনা করে, সে ব্যাটা ততদিনে বাড়ির জিনিসপত্র একে একে সরিয়ে ফেলেছে!

শর্মিষ্ঠা বলল, ভ্যাট্! ভূত কোথায়?

আছে। যোগেশ্বর রহস্যময় হাসলেন। হলঘরে যেই গেছি, কাঠের সেই সিঁড়ির মাথায় অমনি মচমচ শব্দ শুনতে পেয়েছি। কৈ হ্যায় বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সিঁড়িতে উঠলুম আমরা। তারপরে যা দেখলুম,··· বাপ্‌স! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

কী, কী দেখলে?

সাদা কাপড়পরা একটা মূর্তি!

তারপর, তারপর?

মূর্তিটা যেন শূন্যে ভাসছে।

সত্যি?

যোগেশ্বর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন, মিথ্যা নাকি? সাদা কাপড় পরা মূর্তিটা আস্ত একটা কঙ্কাল।

ভ্যাট্! বিশ্বাস করিনে।

শমু. একবিন্দু বানিয়ে বলছিনে। সাদা কাপড়পরা কংকালটার দিকে যেই রিভলবার তাক করেছি, শো করে শূন্যে উঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। ট্রিগারে চাপ পড়েছিল। গুলিও বেরুল। প্রচণ্ড শব্দ হল পোড়ো বাড়িতে। পায়রাগুলো ভয় পেয়ে হুলুস্থূলু বাধাল। আর সেই সময় একটা বিকট হাসি শুনলাম। মেয়েলি হাসি। কতকটা এরকম—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ···।

রাশভারি যোগেশ্বরকে ভূতুরে হাসি হাসতে দেখে শর্মিষ্ঠা খিলখিল করে হেসে লুটোপুটি খেল।

যোগেশ্বর রাগ করে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

এক বর্ণও না।

হুঁউ, খুব সাহস তোমার ! রোসো, কাল বাগানবাড়িটা দেখিয়ে আনব।

শর্মিষ্ঠা বলল, আচ্ছা দাদু, ও বাড়িতে আমরা যদি পিকনিক করতে যাই, কেউ বারণ করবে ?

মোটেও না। অনেকেই তো যায়। তবে রাত্রিবেলা কেউ থাকতে চায় না। সন্ধ্যার আগেই চলে আসে।

শর্মিষ্ঠা ভাবতে ভাবতে আনমনে বলল, আমরা রাত্রিবেলাই যাব। থাকব। পিকনিক করব।

যোগেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, এঁ্যা ! বলো কী ?

ভূত দেখা চাই-ই। শর্মিষ্ঠা শক্ত মুখে বলল।

সর্বনাশ ! কিন্তু আমি বাপু এসবে নেই। বাড়ি ছেড়ে নড়তে পারব না বলে দিচ্ছি। আজকাল যা চোরের বাড় হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা হাসল।...তোমায় দলে নেব না। কাল মিলুদা এসে যাচ্ছে আর এখান থেকে জলিকে নেব।

যোগেশ্বর উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, জলি ? ভোম্বল উকিলের মেয়ে ? বেশ, ভাল। কিন্তু তোমার মিলুদাটা কে ?

মিলনকে চেন না ?

ও, সেই ছোকরা। যোগেশ্বর ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। সে আসছে বুঝি ?

হুঁউ।

আমার এখানেই উঠবে নাকি ?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে বলল, আপত্তি আছে তোমার ? বেশ। সে ট্যুরিস্ট লজে উঠবে।

যোগেশ্বর কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, আহা না, না। তবে ছোকরা বড্ড গণ্ডগোল পাকায়। সেবার আমার গাড়িটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা গুনগুন করে গান গাইতে থাকল। দাতুর কথায় কান দিল না। যোগেশ্বরের গাড়ি বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে।

গেটের কাছে গিয়ে ব্রেক কষে অভ্যাস মতো যোগেশ্বর হাঁক দিলেন, ভগু! ভগো! ওহে ভার্গবচন্দ্র! গেটটা খোল।

গাড়ি বারান্দা থেকে আচমকা ছিটকে বেরিয়ে এল ভগু ঠাকুর। তারপর বলা নেই কওয়া নেই গেটের ওধারে দাঁড়িয়ে ভেউভেউ করে বিকট কেঁদে উঠল।

গাড়ি থেকে একলাফে নেমে যোগেশ্বর ভাঙা গলায় বললেন, কী, কী, কী হয়েছে ভগু?

ভগু বুক চাপড়ে এবং চুল খামচাতে খামচাতে কী সব বলতে থাকল, মাথামুণ্ডু একটুও বোঝা যাচ্ছিল না। তখন যোগেশ্বর একটা কিছু অনুমান করে দৌড়ে লন পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দরজা খোলাই ছিল। সব ঘরে আলো জ্বলছিল।

ভেতরে গিয়েই টের পেলেন কী ঘটেছে।

শর্মিষ্ঠা পেছন-পেছন দৌড়ে এসেছিল। দেখল, যোগেশ্বর পাগলের মতো এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছেন।

তারপর যোগেশ্বর শোবার ঘর থেকে বন্দুক বের করে বারান্দায় গেলেন এবং বেমক্কা দুবার গুড়ুম গুড়ুম করে গুলি ছুঁড়লেন।

তারপর ভাঙা গলায় বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর! চোর! পাকড়ো, পাকড়ো!

শর্মিষ্ঠা ওঁকে পেছন থেকে ধরে ফেলল। বলল, আঃ হচ্ছে কী? কোথায় চোর? বস তো সুস্থ হয়ে বস।

যোগেশ্বর ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন।···নিল যা নিল, কিন্তু আমার ট্রফিগুলো···ওঃ হো হো হো!

শর্মিষ্ঠা ফোনের দিকে এগিয়ে বলল, থানার নম্বর কত?

চোখের জল মুছতে মুছতে যোগেশ্বর বললেন, চাইলেই দেবে।

শর্মিষ্ঠা ফোন তুলল। যোগেশ্বর তখনও গলার ভেতর ও হো হো

করে আর্তনাদ করছেন। সে মুহূর্তে ভগুর কথা মনে আসছে না। এলে হয়তো তাকে গুলি করেই বসতেন।

গাড়িটা গেটের বাইরে দাঁড় করানো রইল। ভগু সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।...

॥ দুই ॥

পুলিস বিভাগের নামকরা ঝুঁদে অফিসার ছিলেন যোগেশ্বর। রিটায়ার করলেও তাঁর প্রভাবের ঘাটতি পড়েনি। নানা ব্যাপারে এ শহরের পুলিস অফিসাররা তাঁর পরামর্শ নিতে দৌড়ে আসেন।

সুতরাং সে-রাতেই যথেষ্ট হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। বাঘের ঘরে ঘোগ—সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বেমালুম কাজ সেরে গেল, এ ভারি আশ্চর্য ঘটনা বটে। বাঘা ডিটেকটিভ অফিসার গঙ্গাধর হাটি কান চুলকে বলেছেন, এটাই সমস্যা। কোনো ক্লু রেখে যায়নি ব্যাটারা। তবে আমার ধারণা, আপনার ভগুচন্দ্র মুখ খুললে একটা কিনারা হয়।

যোগেশ্বর খাপ্পা হয়ে বললেন, আপনার মাথা হয়! ভগুকে আমি জানিনা, আপনি জানেন? ভগু আমার সঙ্গে তিরিশ বছর আছে। চুরিচামারি দূরে থাক, একটা আলপিন হারায়নি আমার বাড়ি থেকে।

কিন্তু ভগুচন্দ্র ছিল কোথায় তখন? গোয়েন্দা ভদ্রলোক বলেছেন। ও বলছে, বাগানে গরু ঢুকেছিল। গরুটা তাড়িয়ে রাস্তার ওপারে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছিল। তারপর পায়ে কাঁটা ফোটে। সেই কাঁটা বের করতে যতক্ষণ সময় লেগেছে, ততক্ষণে চোর জানলার রড কেটে ঘরে ঢুকেছে। যাই বলুন, স্টেটমেণ্টটা কেমন যেন।

যোগেশ্বর রাগ দেখিয়ে বলেছেন, যান মশাই! খালি ভগুচন্দ্র আর ভগুচন্দ্র। এ আপনার কম্ম না। পুলিসসুপার প্রমথকে খবর দিয়েছি। খুব বুদ্ধিমান ছোকরা।

পুলিসসুপার দলবল নিয়ে এসে যোগেশ্বরের বাড়ি চষে ফেললেন।

তারপর আশ্বাস দিয়েছেন, কিছু ভাববেন না মিঃ চ্যাটার্জী। কয়েকটা দিন সময় দিন। অন্তত আপনার অমূল্য ট্রফিগুলো আর তাম্রফলক উদ্ধার করে দেবই। বাকি জিনিষ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না আপাতত। তবে চেষ্টা করব। রাঁতটা এই করে কেটেছে। ভাল ঘুম হয়নি যোগেশ্বরের। বাইরে বারান্দায় দুজন সেপাই সারারাত টহল দিয়েছে। ভোরে যোগেশ্বর তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়েছেন। চোর কি আবার আসবে নাকি ? খামোকা বেচারাদের কষ্ট করা।

শর্মিষ্ঠার ঘুমের অসুবিধে হয় নি। কিন্তু মনে ভয়টা ছিল। চোর যদি আবার এ ঘরেই হানা দেয় ? অবশ্য সেপাই পাহারা আছে। সেই যা স্বস্তি। তবু ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। ভূত চোর দুইয়ে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন !

সকালে ব্রেকফাস্টের পর শর্মিষ্ঠা বলল, শোনো আমি জলিদের বাড়ি যাচ্ছি। মিলুদা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছবে। তুমি যেন ওর অসম্মান করো না।

শোকে মুহ্যমান যোগেশ্বর আনমনে বললেন, করব না ! ছেড়ে দেব ?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে বলল, মিলুদাকে তুমি অসম্মান করবে ?

বুঝতে পেরে যোগেশ্বর বললেন, না, না ! ওর কথা বলিনি। তুমি যেখানে যাচ্ছ, যাও তো ! আমায় বকিও না।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বেরুল।

এই এলাকাটা পুরানো শহরের লেজের মতো গজিয়েছে গত বিশ বছরে। প্রচুর খোলামেলায় একটা করে সুন্দর বাড়ি। গাছপালা ঝোপঝাড়ও যথেষ্ট। তিনটে বাড়ির পর ভোম্বল বাবুর বাড়ি। জজকোর্টে ওকালতি করে পয়সা করেছিলেন ভোম্বলবাবু। শহরের ভেতর পৈতৃক বাড়ি বেচে এখানে বাড়ি করেছিলেন। ভোম্বলবাবুর সঙ্গে যোগেশ্বরের বনে না। কেন বনে না, তা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে একটা বড় কারণ হল, যোগেশ্বরের একটা ডাকাতি কেসের আসামীকে ভোম্বল জজকোর্টে খালাস করতে পেরেছিলেন।

ভোম্বলবাবুর মেয়ে জলির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বড্ড ভাব। শর্মিষ্ঠা দাত্নর বাড়ি ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত আসে। তবে ভাবটা হয়েছে বড়বেলায়। গত বছর নদীর ধারে জোর পিকনিকও করেছিল শর্মিষ্ঠা। কলকাতার মেয়ে বলে মফস্বলী মেয়েরা ওকে নায়িকা করে তুলেছিল।

বাড়ির কাছাকাছি দেখা হয়ে গেল জলির সঙ্গে। জলি বলল, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম। শুনলুম, জেঠুর বাড়ি নাকি চুরি হয়েছে? সত্যি?

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বলল, বিশাল চুরি। চোর খালি বেছেবেছে দাত্নর ট্রফিগুলো নিয়েছে। খান কতক রূপোর রেকাবিও নিয়েছে অবশ্য। সেটা ভুল করে।

ভুল করে মানে? জলি অবাক হয়ে বলল।

তাই মনে হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা ওর হাত নিয়ে আদর করার ভঙ্গিতে বলল। এসব আজেবাজে কথা থাক। শোনো, যে-জন্যে আসছি। ভেরি কনফিডেনশিয়াল।

তুজনে রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গেল। জলি কৌতূহলী হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

শর্মিষ্ঠা বলল, এবেলা মিলনদা—মানে সেই ভদ্রলোক এসে যাচ্ছে···

দ্রুত কথা কেড়ে নিয়ে জলি বলল, শমু! তোমরা কি বিয়ে করে ফেলেছ?

শর্মিষ্ঠা চোখ পাকিয়ে বলল, শাট আপ! বিয়ের কথা তোমার মাথায় এসে গেল? অদ্ভুত তো!

অপ্রতিভ জলি বলল, না—মানে, কনফিডেনশিয়াল বললে কি না?

হুঁ, ভেরি কনফিডেনশিয়াল। শর্মিষ্ঠা চাপা গলায় তুষ্টু হেসে বলল। তার আগে জানতে চাই, তুমি ভূত বিশ্বাস করো কি না?

জলি আকাশ থেকে পড়ার মতো বলল, ভূত! কোথায় ভূত?

তোমার মাথায়। কথাটার জবাব দাও আগে।

ভূত বিশ্বাস করি কিনা বলছ?

হুঁ।

জলি জোরে মাথা নেড়ে বলল, না না এবং না।

কর না তো?

একটুও না।

ধরো, কোনো পোড়ো বাড়িতে আমরা যদি পিকনিক করতে যাই—উঁহু, দিনে নয়, রাত্রিবেলা—তুমি রাজি?

জলি খুশিতে নেচে উঠল। খুব রাজি। ভীষণ রাজি। কিন্তু কে কে যাবে, তাই বলো।

মিলুদা দলে থাকলে আপত্তি আছে তোমার? থাকা উচিত নয়।

এবার জলি একটু কাঁচুমাচু ভাব দেখিয়ে বলল, না, না। বাড়িতে ম্যানেজ করতে হবে। সেটাই প্রব্লেম। মানে, বাইরে রাত কাটানোটা গার্জেনরা পছন্দ করবেন না।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি যদি তোমার গার্জেনদের বলি, জলিকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছি একদিনের জন্য, ওঁরা আপত্তি করবেন?

জলি ভাবতে ভাবতে বলল, ভীষণ আপত্তি করবেন। কিন্তু জায়গাটা কোথায় আগে শুনি?

তোমাদের দেশেই। শর্মিষ্ঠা রহস্যময় হাসল।

কোথায় শুনি?

ফরাসডাঙ্গার বাগানবাড়িতে।

জলি চোখ কপালে তুলে বলল, নন্দন কাননে? ওরে বাবা!

নন্দন কানন মানে?

জলি উদ্বিগ্নমুখে বলল, যে বাড়ির কথা বলছ, তার নাম। বাড়িটার অনেক বদনাম শুনেছি। ভূতটুত আমি মানিনে। কিন্তু ওটা নাকি চোর-ডাকাতের আড্ডা। এলাকার চোরডাকাতরা ওখানে মিটিং-ফিটিং করে।

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বলল, হুঁ। দাদু তাই বলছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভূতের কথাও বলছিলেন। আমার ভীষণ ইচ্ছে, সত্যি সত্যি ভূত আছে কিনা দেখব। কী? ভয় করছে বুঝি?

জলি একটু হাসল।—যাঃ! ভূতটুত বাজে কথা। কিন্তু অতদূর যাবে কীভাবে? বাস রাস্তা থেকে এক মাইল হাঁটতে হবে যে। অনেকদিন আগে একবার আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। বাড়ির ভেতর ঢুকিনি। বাগানে পিকনিক করেছিলুম। বাড়িটার চেহারা দেখে কেমন মিস্‌ট্রিয়াস লাগে।

শর্মিষ্ঠা ব্যস্তভাবে বলল, আমরা বিকেলের বাসে যাব। আমি, মিলুদা আর তুমি। সঙ্গে পিকনিকের জিনিসপত্তর তো থাকবেই। কী কী নেব, লিস্ট করে ফেলি, চলো।

জলি বলল, আরও দু'একজনকে সঙ্গে নিলে ভাল হত, শমু!

শর্মিষ্ঠা আপত্তি করল। নো, নো, নো, নো। দল বাড়ালেই ঝামেলা হবে। এ তো নিছক পিকনিক নয়, এ্যাডভেঞ্চার। বেশি লোক থাকলেই চ্যাঁচামেচি হইহল্লা হবে।

জলি উত্তেজনা চেপে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িতে ম্যানেজ করাটাই যে সমস্যা।

শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়ে বলল, চলো না দেখি—ম্যানেজ করা যায় কি না।

জলি বাধা দিল, না না। আমার গার্জেনদের তুমি চেনো না। দিনের বেলা কোথাও গেলে আপত্তি হয় না। কিন্তু বাইরে রাত কাটানো ইমপসিবল।

হতাশ ভংগিতে শর্মিষ্ঠা বলল, তাহলে?

জলি ফিসফিস করে বলল, শোন। আমি অন্তত এক রাতের জন্য রিভোল্ট করি। তোমার খাতিরে।

শর্মিষ্ঠা খুশি হয়ে বলল, এই তো চাই!

জলি বলল, তাহলে তুমি এখন কেটে পড়, শমু। বাবার কোর্টে বেরুনোর সময় হয়ে এল। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে খেলার মাঠের পাশে হাইওয়ের বাস স্টপে। বিকেল পাঁচটায় বাসটা ছাড়ে। ওখানে পৌঁছয় পাঁচটা দশ-টশে। একটা বটগাছ আছে, সেখানে থাকব। তোমাদের দেখলে তবে চাপব। নৈলে ফিরে আসব। শিগগির বলো, কী কী নেব সঙ্গে?

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমায় কিছু নিতে হবে না। যা নেবার আমরা সব নেব ?

বাঁচলুম। জলি হাসল। সঙ্গে জিনিসপত্তর নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো প্রব্লেম হত।

বাড়ি ঢুকে শর্মিষ্ঠা দেখল, যোগেশ্বর ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছেন। চোখ দুটি প্রায় বন্ধ। শর্মিষ্ঠার পায়ের শব্দে আঁতকে উঠে চোখ খুললেন। তারপর ধমক দিয়ে বললেন, অমন চুপিচুপি কেন—চোরের মতো ? এঁ্যা ? আজ থেকে নিয়ম করে দিয়েছি। এ বাড়িতে যে ঢুকবে কিংবা চলাফেরা করবে সাড়াশব্দ যেন দেয় ! নৈলে···দেখছ, এটা কী ?

বলে ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে রিভলবার বের করে দেখালেন।

শর্মিষ্ঠা খিলখিল করে হেসে উঠল।

যোগেশ্বর বললেন, ডোণ্ট লাফ। দিস ইজ সিরিয়াস।

শর্মিষ্ঠা বলল, ওতে গুলি পোরা আছে তো ?

আলবাৎ আছে। ছটা গুলি পুরে রেখেছি। চোর ব্যাটাচ্ছেলেদের সামনে দাঁড় করিয়ে গুনে গুনে ছুঁড়ব। যোগেশ্বর পায়চারি শুরু করলেন এবং রিভলবারটা পকেটে ঢোকালেন।

শর্মিষ্ঠা একটু চুপ করে থেকে ডাকল, দাদু !

হুঁ, বলো।

মিলুদার আসার সময় হয়ে এল।

তা আমার কী ?

ও বেচারা তো জানে না কিছু। সাড়া শব্দ দিয়ে ঢুকবে না। গুলি খাবে।

শর্মিষ্ঠা রাগ দেখিয়ে বলল, আর ইউ সিরিয়াস ?

আলবাৎ।

ঠিক আছে। বাস স্ট্যাণ্ডে যাচ্ছি। মিলুদা বাসে আসবে। ওকে নিয়ে সোজা ট্যুরিস্ট লজে উঠব। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই গে।

শর্মিষ্ঠাকে পা বাড়াতে দেখে যোগেশ্বর ব্যস্ত হলেন। আহা, ট্যুরিস্ট লজে কেন ? এতবড় বাড়ি খালি পড়ে আছে কী জন্যে ! আমার

হবু নাতজামাই-ই বা কী ভাববে? আমার একটা প্রেসটিজ নেই নাকি?

তাহলে আগে রিভলবারটা আমায় দাও। শর্মিষ্ঠা হাত বাড়াল। তোমায় কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। তুমি ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছ।

অপ্রকৃতিস্থ কথাটার মানে জানো? উন্মাদ। মানে যার মাথা খারাপ। যোগেশ্বর থিয়েটারি ভংগিতে জলদগম্ভীর গলায় বললেন। ইয়েস, মাথা খারাপ। আমার মাথার ঠিক নেই। আমার সারাজীবনের সব কৃতিত্বের পরিচয় লোপাট করে দিয়েছে ব্যাটাচ্ছেলে চোরেরা। ওঃ! ওহো হো! আর আমি বাঁচব না।

দুহাতে চুল আঁকড়ে ধরলেন যোগেশ্বর। ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। শর্মিষ্ঠা দাদুর পাশে গিয়ে আদর করতে করতে বলল, সোনার দাদু! লক্ষ্মী ছেলে! অমন কোরো না। ভেবো না, মিলুদা আসুক। তোমার সব জিনিস উদ্ধার করে ফেলব আমরা।

যোগেশ্বর বললেন, উদ্ধার করবি? তোরা? ফুঃ! হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! বাজে বকিসনে।

এই সময় ধপাধপ শব্দ তুলে মার্চের ভংগিতে ভগু ঠাকুর ঘরে ঢুকল। হাতে শরবতের গ্লাস। বিনীতভাবে বলল, স্যার!

যোগেশ্বর কড়া করে বললেন—বিষ এনেছ তো? দাও। বিষ খেয়ে মরি।

শর্মিষ্ঠা বুঝেছে, ভগু ঠাকুরকে সাড়াশব্দ দিয়ে ঘরে ঢোকার নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। ভগু সামনের নিচু টেবিলে ট্রে রেখে গোমড়া মুখে চলে গেল। শর্মিষ্ঠা শরবতের গেলাসটা দাদুর মুখের সামনে ধরে বলল, এস। খাইয়ে দিই।

যোগেশ্বর বাচ্চা ছেলের মতো এক ঢোঁক খেয়ে কাতরস্বরে বললেন, এমন যদি হত, অনশন ধর্মঘট করলে হারামজাদারা আমার জিনিসগুলো ফেরত দিত তাহলে তাই করতুম। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে পোস্টার টাঙিয়ে বসে পড়তুম। কিন্তু ওরা তো মিনিস্টার নয়, চোর। অনশনে মারা পড়লেও ওরা আসবে না। ওদের হৃদয় নেই—হার্টলেস ক্রিয়েচার্স!

শর্মিষ্ঠা বলল, নাও। হাঁ করো। ঢেলে দিই।

যোগেশ্বর চুপচাপ ঢোকে ঢোকে গিলে ফেললেন শরবতটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে গোঁফ মুছলেন। তারপর বললেন, বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন বলো তো? তাই ভগুকে বলেছিলুম শরবত তৈরি করো। খেয়েও কিন্তু গলার ভেতরে শুকনো ভাবটা যাচ্ছে না। ডাক্তারকে খবর দেব নাকি ?

বলে হাত বাড়িয়ে ফোন তুললেন। শর্মিষ্ঠা উঠল। বাইরের বারান্দায় চলে গেল। বারান্দায় একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে লনে নামল। অস্থির ভাবে মিলনের প্রতীক্ষা করতে থাকল। শর্মিষ্ঠাও দাদুর মতো খেয়ালী। মাথায় যেটা ঢুকেছে, সহজে বের হয় না। কতক্ষণে ফরাসডাঙ্গার পোড়ো বাগান বাড়িতে যাবে, কখন কলকাতা থেকে মিলন আসবে, সেই ভাবনায় আর সময় কাটতে চায় না।

মিলন গাঙ্গুলী উদীয়মান স্পোর্টসম্যান। ফুটবলে ইতিমধ্যে খুব নাম কিনেছে। কলকাতার একটা মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় সে। সেই সূত্রে শর্মিষ্ঠার বাবার সঙ্গে প্রথমে আলাপ পরিচয়। তারপর ওদের কোয়ার্টারে যাতায়াত থেকে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক এবং শেষে দুপক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে মিলনের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ে আসন্ন হয়ে উঠেছে। আর বড় জোর মাস দুই বাকি আছে শুভকর্মের। কিন্তু শর্মিষ্ঠা অন্যদের সামনে তার হবু বর সম্পর্কে দাদাটাদা করে বলে। একলা হলে সোজা নাম ধরে ডাকাডাকি, নৈলে মিলুদা। কখনও মিলনদা। মিলনের চেহারায় স্বভাবত খেলোয়াড়োচিত ঋজু ভাবভংগি আছে। শক্তসমর্থ পেটাই গড়ন। মোটামুটি ফর্সা শর্মিষ্ঠার তুলনায়। শর্মিষ্ঠাকে সুন্দরী নিশ্চয় বলা যায়, কিন্তু গায়ের রঙটা তত ফর্সা নয়। তার গড়নে কোমলতা তত নেই, ঈষৎ পুরুষালি ভাব আছে। মুখচোখে তীক্ষ্ণতা আছে। স্পোর্টসেও প্রবণতা আছে। যদিও ততকিছু নেশা নেই বলে বেশিদূর এগোয় নি। মিলনের ইচ্ছা, ও স্পোর্টসে তার মতই মেতে উঠুক। সুইমিংয়ে দক্ষতা আছে শর্মিষ্ঠার। রাইফেল শুটিংয়েরও হাত মন্দ না। কিন্তু মুশকিল করেছে তার

কবিত্বশক্তি। রাশি রাশি পদ্য লেখে খাতায়। ভীষণ ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামায়। মিলনের অপছন্দ শুধু এটুকুই।

দশটা বেজে গেল মিলনের পৌঁছতে। রাস্তায় তাকে দেখামাত্র শর্মিষ্ঠা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার আসার কথা ছিল শর্মিষ্ঠার সঙ্গেই। কিন্তু পর-পর দুদিন খেলা ছিল বলে আসতে পারে নি।

কাঁধে নীল ব্যাগ ঝুলিয়ে ধীরেসুস্থে আসছিল মিলন। এ বাড়িতে সে এর আগে বার তিনেক এসেছে শর্মিষ্ঠাদের সঙ্গে। বাড়িটা সে চেনে। গেটে শর্মিষ্ঠাকে দেখে একটু হেসে বলল, বাসস্ট্যাণ্ডে তোমাকে খুঁজছিলুম।

শর্মিষ্ঠা বলল, তেমন কোন কথা ছিল না।

কিন্তু আশা ছিল।

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বলল, মাঝে মাঝে হতাশ হওয়া ভাল। যাক গে, শোন, দাদুর বাড়িতে কাল বিকেলে চুরি হয়েছে। দাদুর সব ট্রফি আর দামী কী সব জিনিষ চুরি করেছে চোরে। দাদুর ব্যাপার তো জানো। সামলাচ্ছি ওঁকে। দাঁড়িয়ে কেন? এস।

লনে হাঁটতে হাঁটতে মিলন বলল, পুলিস ফ্যামিলিতে চুরি। চোরের সাহস তো কম নয়!

শর্মিষ্ঠা হাসল। হ্যাঁ। শহরের পুলিসফোর্স জান লড়িয়ে দিয়েছে। এক মিনিট—

কী? মিলন দাঁড়াল গাড়িবারান্দায়। যোগেশ্বরের গাড়িটা ওখানেই থাকে। গাড়িতে হেলান দিল সে।

শর্মিষ্ঠা চাপা গলায় বলল, আজকের প্রোগ্রামটা আগে জানিয়ে দিই! তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

ব্যাপারটা কী? হঠাৎ ভূতটুত আসছে কোত্থেকে?

যদি বলি, একটা ভয়ংকর পোড়োবাড়িতে আমরা রাত কাটাতে যাব, তুমি রাজি?

মিলন গাল চুলকে বলল, কিছু বুঝলুম না। চুরি হয়েছে বলছ, আবার বলছ ভয়ংকর পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে যাবে। এসবের মানে কী?

শর্মিষ্ঠা বলল, এ্যাডভেঞ্চার।

চুরির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কি কিছু ?

নেই।

ভেতর থেকে যোগেশ্বরের গর্জন শোনা গেল, কে ? কে ওখানে ? হু ইজ দেয়ার ?

শর্মিষ্ঠা বলল, আমরা।

আমরা কারা ?

চোরেরা !

ওমনি দরজার পর্দা ফাঁক করে যোগেশ্বরের মাথা বেরিয়ে এল। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে হাসলেন। হেসেই গম্ভীর হলেন। বললেন, রসিকতার মনমেজাজ এখন নেই। ওটা কে ?

আমি মিলন, ঠাকুর্দা। বলে মিলন এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল।

তা ওখানে দাঁড়িয়ে কী ফিসফিস কথাবার্তা হচ্ছে ? যোগেশ্বর সন্দেহসংকুল ভঙ্গিতে বললেন। দেখ বাবু, বাড়িতে সদ্য চুরিচামারি হয়েছে। এই সিচুয়েশানে অমন গুজগুজ ফিসফিস কাণ্ডকারখানা ভাল নয় ! এস, ভেতরে এস।

ভেতরে ঢুকলে যোগেশ্বর বললেন, যাও। কাপড়চোপড় বদলে বিশ্রাম-টিশ্রাম করে নাও। তারপর কথাবার্তা হবে। শমু, ঠাকুরকে বলে দে, গেস্ট এসেছে।

মিলন বলল, কী চুরি হয়েছে ? কী ভাবে হল বলুন তো ?

সব পরে শুনবে। এখন আমি কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। যোগেশ্বর গোমড়া মুখে পায়চারি শুরু করলেন।

মিলন শর্মিষ্ঠাকে অনুসরণ করল। বাগানের দিকের একটা ঘরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, তুমি তো চা খাও না। সফট ড্রিংক আনছি।

না। ঘেমে তেতে এসে ঠাণ্ডা খাব না। মিলন খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

শর্মিষ্ঠা একটা চেয়ারে বসে বলল, স্নান করে নাও তাহলে। তারপর সেই প্রোগ্রামের কথাটা বলব।

মিলন বলল, প্রোগ্রাম মানে ভূতটুতের ব্যাপারটা তো?

হ্যাঁ।

বলো, শুভস্য শীঘ্রম।

এখনই বলব?

তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি ভীষণ চঞ্চল। অতএব এখনই বলো।

শর্মিষ্ঠা হাসল।...ভূতের ভয়ে আমাদের ফেলে পালিয়ে আসবে না তো?

আহা, আগে বলো না ব্যাপারটা?

শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস হয়ে চাপা গলায় বলল, এখান থেকে আট মাইল দূরে একটা পোড়ো বাগানবাড়ি আছে। নন্দন কানন নামে। সেখানে নাকি অসংখ্য ভূত আছে। আমি, তুমি আর জলি—মানে সেই মেয়েটি...

বুঝেছি। বলো।

আমরা তিনজনে বিকালের বাসে সেখানে যাব। বাসস্টপ থেকে নাকি এক মাইল হাঁটতে হবে। জলি রাস্তা চেনে।

তারপর?

সারারাত নন্দন কাননে কাটাব। আবার কী?

যদি সত্যি ভূত থাকে?

তাহলে তো ভারি আনন্দের ব্যাপার হবে।

কিন্তু তোমার দাদু আপত্তি করবেন না?

করবে না। করলেও শুনব না।

বেশ।

তাহলে সঙ্গে কী কী নেব একটা লিস্ট করে ফেলা যাক।...বলে শর্মিষ্ঠা ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বের করল।

শর্মিষ্ঠা আর মিলনের ব্যাপার স্যাপার দেখে যোগেশ্বরের খটকা লেগেছিল। বিকাল নাগাদ বুঝলেন, ওরা কোথাও যাবার মতলব করেছেন।

পর্দার ফাঁকে একটা চোখ রেখে চুপিচুপি দেখলেন, দুটো ব্যাগ বোঝাই হয়ে আছে। তখন সটান ঘরে ঢুকে বললেন, এ কিসের ষড়যন্ত্র?

শর্মিষ্ঠা হাসল।—ভূত বধের।

ভূত? যোগেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন।

শর্মিষ্ঠা বলল, হ্যাঁ, তোমাদের সেই নন্দন কাননের কঙ্কালবধের পালা হবে।

যোগেশ্বর আঁতকে উঠলেন. সর্বনাশ! তোমরা কি সত্যি ওখানে রাত কাটাতে যাচ্ছ? দেখ, মারা পড়বে। একেবারে প্রাণটি যাবে।

শর্মিষ্ঠা ঘড়ি দেখে বলল, এই রে! পাঁচটা হয়ে এল যে। চলো মিলুদা।

মিলন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বলল, ঠাকুর্দার গাড়িটা পেলে মন্দ হত না।

যোগেশ্বর মুখ ভেংচে বললেন, মন্দ হত না! তোমরা যাচ্ছ যাও, আমার গাড়ির দিকে নজর কেন বাপু?

শর্মিষ্ঠা লাফিয়ে উঠেছিল মিলনের কথায়। আদুরে গলায় বলল, দাও না দাদু তোমার গাড়িটা।

যোগেশ্বর জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না।

মিলন বলল, বুঝতে পারছ না শমু? ঠাকুর্দা ভাবছেন, তাঁর গাড়ির ঘাড় মটকে দেবে নন্দন কাননের ভূত।

যোগেশ্বর বিদ্রূপ কানে নিলেন না। বললেন, যাই করো, কাজটা তোমরা ভাল করছ না! একে তো চুরিটুরির বিপদে ভুগছি, তার ওপর যদি তোমাদের কিছু হয়—আমিই শেষপর্যন্ত মারা পড়ব! সেই বলছি, যেও না।

মিলন বলল, বরং আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে তাকে নিঃশব্দে ভর্ৎসনা করল। যোগেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাবার মুখ রেখেছে চোর ব্যাটাচ্ছেলেরা? এই যে তোমরা যাচ্ছ—তোমাদের নিষেধ করছি, অথচ আমিও তো

একসময় প্রচণ্ড এ্যাডভেঞ্চারিস্ট ছিলুম। আমার কি মন মানছে? কিন্তু উপায় নেই।

শর্মিষ্ঠা বলল, মিলুদা! পাঁচটা বেজে গেল। বাস ফেল করব কিন্তু।

মিলন বলল, চলো।

দুজনে বেরিয়ে গেটের কাছে গেছে, এমন সময় যোগেশ্বরের গলা শোনা গেল।···ওয়েট, ওয়েট।

যোগেশ্বরের হাতে তাঁর বন্দুক। হন্তদন্ত কাছে এসে বললেন, ভেবে দেখলুম, তোমরা নিরস্ত্র হয়ে যাচ্ছ। এটা সঙ্গে নাও। এই কার্তুজ-গুলোও রাখো। কিন্তু সাবধান, মানুষের ওপর গুলি ছুঁড়ো না। কিছু দেখলে-টেখলে যদি গুলি ছুঁড়তেই হয়, আকাশের দিকে ছুড়বে।

শর্মিষ্ঠা খুশি হয়ে বন্দুকটা নিল। কার্তুজগুলো ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল। তারপর যোগেশ্বরের পায়ের ধুলো নিল। মিলনও।

যোগেশ্বর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।···বরং এক কাজ করা যাক। চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। রাতটা কাটিয়ে ফের সকাল সাতটার মধ্যে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব। ভেবো না।

ভগু ঠাকুরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, ভগু! এক্ষুনি আসছি। নজর রাখবে। গরুটরু এলেও বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। সাবধান।

ভগু ঠাকুর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল। বড় বড় দাঁত খুলে হেসে মাথা দোলাল। সে টের পেয়েছে, ওনাদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে। এসব সময় সে ভারি খুশি।

যোগেশ্বর গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। খেলার মাঠের ধারে বটতলায় জলি দাঁড়িয়ে ছিল। শর্মিষ্ঠা বলল, দাদু, এক সেকেণ্ড। দাঁড় করাও এখানে জলিকে তুলে নিই।

যোগেশ্বর ভুরু কুঁচকে জলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। জলি বলল, ঠাকুর্দা কেমন আছেন?

যোগেশ্বর খেঁকিয়ে উঠলেন। ঠাকুর্দা বলা হচ্ছে যে? তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি খেয়াল নেই বোকা মেয়ে কোথাকার? অলওয়েজ জেঠু জে বলবে।

জলি হাসতে হাসতে বলল, সে তো বলি। যখন শমু থাকে না, তখন। আপনার সঙ্গে আমার তুরকম সম্পর্ক।

যোগেশ্বর একথায় যেন সন্তুষ্টই হলেন। গাড়ির গতি ঈষৎ বাড়িয়ে দিলেন। হাইওয়ে বেশ চওড়া। তুধারে গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। বিকেলের লালচে রোদে তাদের চেকনাই ফুটেছে। একটু পরে মন ভাল হয়ে গেল যোগেশ্বরের। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, জলি। তুমি তো বেশ গাইতে পারো। একখানা মনভালো করা গান গাও তো দিদি।

জলি বলল, গাইতে হলে সবাই মিলে গাইব।

মিলন বলল, নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি শুরু করুন।

শর্মিষ্ঠা বলল, একটা শর্ত। দাতুকেও গলা মেলাতে হবে।

জলি গাইতে শুরু করলে মিলন ও শর্মিষ্ঠা গলা মেলাল। একটু পরে দেখা গেল, খেয়ালী মানুষ যোগেশ্বরের হেঁড়ে গলা বেসুরো হয়ে ভেসে উঠছে সেই কোরাসে।

বসন্তের বিকেলে নির্জন রাস্তায় চাপা শব্দ তুলে চলেছে পুরনো মডেলের কালো একটা গাড়ি।

হাইওয়ে থেকে নন্দন কানন পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তাটা আর এখন রাস্তা হয়ে নেই। একশো বছর আগে পূর্ণিয়ার জমিদার বাগান-বাড়িতে যাতায়াতের জন্য সংকীর্ণ একটা রাস্তা বানিয়েছিলেন। খোয়া ঢালা হয়েছিল। তুধারে অনেক গাছও লাগানো হয়েছিল। এখন রাস্তাটা খানাখন্দে হতশ্রী হয়ে গেছে। তবে জলকাদা নেই কোথাও। চৈত্রমাসে সব জলকাদা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু নন্দন কাননের সামান্য দূরে পৌঁছে রাস্তার অবস্থা একেবারে জঘন্য হয়ে রয়েছে। অনবরত খানাখন্দ আর এবড়োখেবড়ো মাটিতে টলতে টলতে অতিকষ্টে এগিয়ে যোগেশ্বরের গাড়ি শেষ পর্যন্ত আটকে গেল। শুধু তাই নয়, ধকলের চোটে বিগড়েও গেল। অনেক ঠেলাঠেলি করে নড়ানো গেল না। তখন হতাশ হয়ে যোগেশ্বর বললেন, কপালে তোমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস

আছে। ভূতের কিল খাওয়াটাও আছে। চলো, এগোই। গাড়ি এখানেই থাক। সকালে দেখা যাবে।…

তিন

ভাল আঁকিয়ে বলে মফস্বলে কৃত্তিবাসের প্রচুর খ্যাতি আছে। সম্প্রতি তাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলে টানাটানি শুরু হলে সে কতকটা গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দলের শাসানি খেয়ে তার অবস্থা শোচনীয়। প্রথম প্রথম দুদলেরই মন রাখতে পোস্টার এবং ছবি রাশি রাশি এঁকেছিল সে। কিন্তু কোন দলই এমনটা চায় না। যে কোন একটা দলে তাকে যোগ দিতেই হবে। চরম বিপদ ঘনিয়ে এল দেয়ালপোস্টারে প্রধানমন্ত্রীর ছবি এঁকে। একদলের চাপে কৃত্তিবাস শহরের একটা স্কুলের একপাশের দেয়ালে প্রধানমন্ত্রীকে মা কালীর চেহারায় আঁকতে হয়েছিল হাতে খড়গ নিয়ে তিনি এলোকেশী ভয়ংকরী হয়ে সর্বহারাদের মুণ্ডু কাটছেন। অন্য পাশের দেয়ালে তিনি অনেকটা মা সরস্বতীর অহিংস মূর্তিতে এক হাত তুলে বরাভয় দিয়ে অন্যহাতে বীণা বাজাচ্ছেন। ফিল্মস্টারের আদল। মুখটা কোন নায়িকার, তাও লোকে চিনতে পেরেছিল।

কিন্তু এবার আর মন যোগান গেল না। একদল অন্যদলের দেয়াল-চিত্র দেখে মহাখাপ্পা হয়ে কৃত্তিবাসের ওপর চড়াও হল। গতিক দেখে কৃত্তিবাস গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে ফরাসডাঙার বাগান বাড়িটা আবিষ্কার করেছিল। তারপর তার মাথা খুলে গেছে।

এমন নিরাপদ আশ্রয় আর দুটি নেই। সারাটা দিন এখানে কাটানো যায়—কেউ টের পাবে না এবং রাত এলে চুপিচুপি আট মাইল পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরা যায়। এবং এজন্য একটা সাইকেলই যথেষ্ট।

কৃত্তিবাসের একটা পুরনো ঠনঠনে সাইকেল জলের দামে কেনা ছিল।

বেকার যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দামী সম্পত্তি থাকার কথা নয়। সেই সাইকেল চেপে কাকডাকা নিঃঝুম ভোরে সে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে কিছু পাঁউরুটি, কলা বিস্কুট, কিংবা স্রেফ কয়েকটা চাপাটি আর আলুর-দম এবং একটা বড় ফ্লাস্কে চা নেয়। তবে বেশি খিদে পেলে নন্দন কাননের কাছাকাছি মাঠের ক্ষেতে শকরকন্দ আলু কিংবা আখও মেলে। গঙ্গাতীরের মাটি বড় উর্বর। সেদিন একটা জমি থেকে মরশুমের শেষ মূলো উপড়ে খেতে গিয়ে কৃত্তিবাস চাষীদের তাড়া খেয়েছিল। ভাগ্যিস ওরা তাকে জঙ্গলে খুঁজে পায়নি। তাছাড়া বাগানবাড়িটার প্রচণ্ড বদনামও আছে। যেই তারা বাগানবাড়ির কাছে এসেছে দোতলার একটা ঘর থেকে কৃত্তিবাস টুপ করে একটা মড়ার মাথা গলিয়ে ফেলে-ছিল। দেখা মাত্র লোকগুলো আঁতকে উঠে পালিয়ে যায়।

মড়ার খুলি নন্দন কাননের নীচে গঙ্গার চড়ায় পাওয়া যায়। পাশেই একটা শ্মশান আছে। কয়েকটা খুলি যে সে কুড়িয়ে এনে রেখেছিল, তার পেছনে কাকেও ভয় দেখানোর মতলব ছিল না কৃত্তিবাসের।

সে খুলিগুলোকে মডেল করে ছবি আঁকতে চেয়েছিল। সেদিন চমৎকার ভয় দেখানো গেল তাই দিয়ে।

সারাটা দিন সে নিরিবিলি ছবি আঁকে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি। সে ক্রমশ টের পেয়েছে, এই পোড়ো বাড়িতে আসার পর তার ছবি আঁকার হাত যেমন খুলে যাচ্ছে, তেমনি আঁকার বিষয়ও অদ্ভুত ভাবে বদলে যাচ্ছে।

ভয়ংকর এক অমানুষিক ও পৈশাচিক জগতকে সে যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে জগতের অনেকটাই অন্ধকার এবং এই চেনাজানা আলোকিত জগতের ক্ষীণ একফালি আলো গিয়ে পড়ে সেখানে। তাই দিয়ে দেখা যায় রহস্যময় ভীষণতম সব বস্তু এবং কিম্ভুত প্রাণীকে।

এই কদিনে একগাদা এইসব ছবি সে একেছে এবং জীর্ণ পলেস্তারাখসা দেয়াল জুড়ে সেঁটে রেখেছে।

নন্দন কাননে ওপরে নিচে চব্বিশটে ঘর। ছাদের ওপরও একটা চিলেকোঠা আছে। ভেতরের সিঁড়ি কাঠের। নিচের প্রকাণ্ড হলঘর

থেকে সেটা দোতলায় উঠে গেছে। আরেকটা সিঁড়ি আছে বাড়ির বাইরে দেয়ালের গা বেয়ে। সেটা খুবই ঘোরালো সিঁড়ি এবং সংকীর্ণ। লোহার তৈরী সিঁড়িটা জং ধরে প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। দোতলায় উত্তরের একটা ঘর থেকে ওদিকে নামা যায়। কিন্তু সিঁড়ির নিচেই ইটের স্তূপ আর ঘন ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। ওখানে সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখে কৃত্তিবাস ওই সিঁড়ি বেয়ে নামার চেষ্টা করেনি।

প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বাড়ির এলাকা। চারদিকের পাঁচিল ভেঙেচুরে স্তূপ হয়ে রয়েছে। জঙ্গল আর জঙ্গল। এক সময়কার সুন্দর প্রাঙ্গণ আর বাগিচাতেও জঙ্গল। ভাঙা ফোয়ারার ফাটলে কাশবন মাথা তুলেছে। এখন চৈত্রে সাদা কাশ ফুলগুলো হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের ভ্রম সৃষ্টি করে। কেন্দ্রের পরীমূর্তিটার নাক ভাঙা। জলের কুম্ভ নিয়ে নগ্ন দেহে ঝুঁকে আছে। কুম্ভটার পেট খসে গেছে।

আর বাড়িটার অবস্থাও তেমনি প্রকৃতির করতলগত। আস্ত ঘর খুব কমই আছে। দরজা জানালা কবে লোকেরা খুলে নিয়ে গেছে। সব হাঁ করে রয়েছে। বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে দোতলার খানিকটা ধসে গেছে। বড় বড় কড়িবরগা ঝুলে রয়েছে। মাঝে মাঝে চুণবালি ঝরঝর করে ঝরে পড়ে।

শেয়াল, খটাস বেঁজি, ইঁদুর এবং তাই সাপেরও রাজ্য এখানে। পাখিও কম নেই। পায়রা, চামচিকে, দাঁড়কাক, চড়ুই—এমন কি, অন্যান্য পাখিরাও ডিমপাড়ার ঋতুতে এই বাড়িতে বাসা বানায়।

পাশের গ্রামের একটা লোকের ওপর নন্দন কানন দেখাশোনার দায়িত্ব আছে। সে মাসে মাসে পূর্ণিয়া থেকে একসময় টাকাকড়ি নিয়মিত পেত। এখন পায় না বলে আর দেখতেও আসে না।

কৃত্তিবাসের প্রথম-প্রথম গা ছমছম করত। একটু শব্দেই চমকে উঠত। কিন্তু ক্রমশঃ সব সয়ে গেছে। তাই বলে এখানে রাত কাটানোর কথা সে ভাবতেও পারে না। সে লক্ষ্য করেছে, বেলা যখন ফুরিয়ে আসে, বাড়িটা যেন তত ঘুম থেকে জেগে উঠতে চায়। কী এক রহস্যময় নড়াচড়া শুরু হয় বাড়ির ভেতর। অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যেতে

থাকে। গঙ্গার ওপারে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা যেন এক অতিপ্রাকৃত শক্তির হাতে চলে যায়। গঙ্গার দিক থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসে। ঝোপঝাড় গাছপালা হুলুস্থুল হতে থাকে। বাড়ির ভেতর ঘরে-ঘরে সেই হাওয়া বুনোঘোড়ার মতো দুদ্দাড় শব্দে ঢুকে পড়ে।

তখন কৃত্তিবাসের আর থাকার সাধ্য নেই। আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে সে কেটে পড়ে। সাইকেলে যেতে-যেতে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখে নেয়। মনে হয়, নন্দন কাননে যত ছবি সে এঁকেছে সেই ছবির বিকট বস্তু ও কিম্ভূত প্রাণীরা বেরিয়ে পড়েছে ছবি থেকে এবং প্রচণ্ড হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে।···

সেদিন তখনও সূর্য ডোবেনি। ঘড়িতে বাজছে প্রায় ছটা। দিন এখন বড় হয়েছে। বিকেলের লালচে রোদ পিচকিরির ধারায় গঙ্গার ওপার থেকে এসে ছড়িয়ে পড়েছে নন্দন কাননের ওপর। ছবি আঁকা শেষ করে কৃত্তিবাস ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখান থেকে বহুদূর নজরে আসে। প্রতিদিনই বাড়ি ফেরার আগে এখানে একবার এসে দাঁড়ায় সে। নিছক দৃশ্য উপভোগও বটে—আবার ফেরার রাস্তাটাও দেখে নেওয়া যায়, লোকজন আছে কি না। তার এই আস্তানার কথা টের পেলে রাজনীতিওলারা এখানে এসে তার ওপর জুলুম করবে।

কৃত্তিবাস পোড়ো রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার বুকটা ধক করে উঠল।

একটা কালো মোটরগাড়ি আসছে। অমন রাস্তায় মোটরগাড়ি আসার কথা ভাবাও যায় না। অথচ সত্যি সত্যি আসছে।

তাহলে কি রাজনীতিওলারা তার খবর পেয়ে গেছে? তাকে তুলে নিয়ে যেতে আসছে?

গাড়িটা একখানে আটকে গেল। তারপর কৃত্তিবাস আরও অবাক হয়ে দেখল, গাড়ি থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক, দুটি যুবতী এবং একটি যুবক নামল। ব্যাপারটা কী? কৃত্তিবাসের ভয়টা চলে গেল। সে কৌতূহলী হয়ে ওত পেতে রইল।

ওরা গাড়িটা ঠেলাঠেলি করে নড়াতে পারল না। তখন গাড়িটা রেখে নন্দন কাননের দিকে হাঁটতে থাকল। একটি মেয়ের হাতে বন্দুকও রয়েছে। কৃত্তিবাস হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কাছাকাছি এলে কৃত্তিবাস যোগেশ্বর ও জলিকে চিনতে পারল। অন্য মেয়েটিকেও দেখেছে মনে হল। তারপর মনে পড়ে গেল, যোগেশ্বরের সেই কলকাতার নাতনি। আলাপের প্রশ্নই ওঠে না। যোগেশ্বর বড় কড়া দেমাকী লোক। কারুর সঙ্গে বিশেষ মেশেন না। তাছাড়া কৃত্তিবাসের পুলিস সম্পর্কে একটা চাপা ভীতি আছে। ভদ্র-লোক রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার হলেও স্থানীয় পুলিস ও শাসকমহলে প্রবল প্রতিপত্তি আছে, কৃত্তিবাস জানে। সে এসব লোককে পছন্দও করে না। তার ধারণা, আর্ট এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

আরও কাছে এলে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য কৃত্তিবাস ঝটপট নেমে দোতলায় এল এবং এঘর-ওঘর হয়ে সাবধানে দক্ষিণের একটা ঘরের জানলায় উঁকি দিল।

যোগেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তুলে বাড়িটা দেখিয়ে গাইডের বক্তৃতার ঢঙে বললেন, এই হল সেই নন্দন কানন। অভিশপ্ত নন্দন কানন বলতে পার। ওখানেই একদল ডাকাত এসে রেঁদেভ্যু করছে খবর পেয়ে আমরা হানা দিয়েছিলুম।

শর্মিষ্ঠা বলল, কংকাল দেখেছিলে কোন ঘরে?

হলঘরে না ঢুকলে দেখা যাবে না।...বলে যোগেশ্বর পা বাড়ালেন।

মিলন বলল, ভূত থাকা খুবই দরকার এমন পোড়বাড়িতে। থাকলে ধন্য হয়ে পায়ের ধুলো নেব।

জলি ও শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল। যোগেশ্বর কড়া স্বরে বললেন, দিস ইজ নট্ জোক। সত্যি কিছু ঘটলে ঠেলা টের পাবে।

জলি বলল, ঠাকুর্দা রান্না করতে পারেন তো? পিকনিকে রান্না করে না খেলে জমে না।

যোগেশ্বর বললেন, পারলেও এখানে রান্না করতে আমি আসিনি।

শর্মিষ্ঠা বলল, আগে একটা ঘর বেছে নেওয়া যাক। ও দাদু, ঘরগুলোর অবস্থা যে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে। ধসে পড়বে না তো?

এতকাল যখন পড়েনি, আজ রাতে অন্তত পড়বে না। বলে মিলন দৌড়ে চওড়া সিঁড়িতে উঠল। সিঁড়ির মাথায় একটা ভাঙা কামান রয়েছে। সে কামানটার ওপর ঘোড়ার মতো বসল। জলি তার পাশে গিয়ে বলল, পক্ষিরাজ ঘোড়া ভাবলেন বুঝি?

যোগেশ্বর হল ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। বললেন, শমু! এখানেই থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছে। কড়িকাঠ আর দেয়াল মজবুত হয়ে আছে।

শর্মিষ্ঠা চারদিক দেখে নিয়ে বলল, হুঁ। ভাল জায়গা। কিন্তু নোংরা হয়ে আছে যে!

যোগেশ্বর বললেন, শতরঞ্চি পাতলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বাইরে মিলন তখনও কামানের ওপর বসে আছে। জলি পক্ষিরাজের কথা বলায় সে হাসতে হাসতে বলেছে, তাহলে আমি রাজপুত্তুর। রাজকন্যা—ধরুন, এই প্রাসাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। আমি সবে তেপান্তর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছি। তারপর···

জলি বলল, আপনার রাজকন্যা ঘুমোবার মেয়ে নয়। ওই দেখুন, কেমন কাজের মেয়ে। কোমরে আঁচল বেঁধে কাজে নেমেছে।

ঘুরে দেখে মিলন মুখ টিপে হেসে চাপা গলায় বলল, রাজকন্যাকে কেমন রাক্ষুসীর মত দেখাচ্ছে না?

জলি বলল, এই! বলে দেব কিন্তু।

মিলন ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, চুপ!

ভেতর থেকে শর্মিষ্ঠা ডেকে বলল—জলি, শুনে যাও।

জলি ঘরে গিয়ে বলল—বাঃ! দারুণ! কিন্তু রান্না হবে কোথায়?

যোগেশ্বর বললেন, এখানেই হোক। ইঁটের উনুন বানিয়ে ফেল। এই আমি বসলুম। ভীষণ টায়ার্ড। তাছাড়া কাল রাতে একেবারে ঘুম হয় নি। হ্যাঁ, শোনো—আগে চা বা কফি করে ফেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লে জাগিয়ে দিও।

যোগেশ্বর দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন।

জলি বলল, একটা কুকার আনা উচিত ছিল। অত বড় এক বালতি জল আনা হল, কুকারের কথা ভুলে গেলে?

শর্মিষ্ঠা বলল, তাহলে আর পিকনিক কিসের? কখনও স্কাউটিংয়ে যাওনি?

গেছি।

তাহলে ভাবছ কেন? এখনও আলো আছে। কাঠ কুড়িয়ে আনো।

শর্মিষ্ঠা বেরিয়ে গেল। জলিও বেরুলো।

বাইরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, বাঃ মিলুদা! তোমার অদ্ভুত ব্যাপার তো?

মিলন কামানটার ওপর সেইভাবে বসে রয়েছে। বলল, কী অদ্ভুত?

চোখ পাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা হাসল।...ইঁট চাই উনুন করতে হবে। ওঠ!

মিলন অনিচ্ছাসত্বে উঠে সিঁড়ির ওপাশে ইঁটের স্তূপ থেকে কয়েকটা ইট তুলল। জলি বলল, আমি কাঠ আনি। শমু, ছুরি কোথায় রেখেছ?

শর্মিষ্ঠা বলল, ছুরি দিয়ে কাঠ কাটবে? সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিলন ঘরের ভেতর ইট রেখে এসে বলল, ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তিনজনে আরেক দফা হাসল। তারপর শর্মিষ্ঠা বলল, চল। সবাই মিলে কাঠ খুঁজে আনি। তারপর আগে কফির ব্যবস্থা। কফি খেয়ে চাঙ্গা হওয়া দরকার।

ওরা জঙ্গলে শুকনো কাঠকুটো কুড়োতে গেল। তখনও রোদের আভা মিলিয়ে যায় নি। পাখপাখালি ডাকছে। কোথায় কী ফুল ফুটেছে, তার মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। ভুতের কথা আর কারুর মাথায় নেই আপাতত।

হলঘরের বড় সিঁড়ির মাথায় হাঁটু দুমড়ে বসে তখন কৃত্তিবাস রেলিঙের ফাঁক দিয়ে যোগেশ্বরকে দেখছে। শর্মিষ্ঠাদের কথাবার্তা সব সে শুনতে পেয়েছে। তার মনে প্রচণ্ড লোভ জেগেছে ওদের দলে ভেড়ার জন্য।

জীবনে যেন এক দারুণ আনন্দময় ঘটনা ঘটতে চলেছে—সে তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাংলার মত।

কিন্তু যত ভয় যোগেশ্বরকে। উনি বাইরের কাকেও বরদাস্ত করবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই উচ্চবিত্তদের সামনে সে এক নেহাত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে। জলির সঙ্গে যদিও তার পরিচয় অল্পস্বল্প আছে, কিন্তু সে নিছক বাইরে-বাইরে। তাকে পরিচয় বলাও হয়তো ভুল।

কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক সমস্যা হচ্ছে, জলি তাকে এখানে দেখে নিশ্চয় ফিরে গিয়ে অন্যদের কাছে গল্প করবে। তার ফলে কোনভাবে কথাটা চাউর হয়ে যাবে রাজনীতিওলা ছেলেদের কাছে।

তাই কৃত্তিবাস বড় দ্বিধায় পড়ে গেছে। সে কী করা উচিত ভাবছে। তাছাড়া তাকে যদি বাড়ি ফিরতে হয়, এই হলঘর নিয়েই বেরুতে হবে। উত্তর-পূর্বের সেই সিঁড়ি দিয়ে প্রাণ গেলেও নামতে সে রাজি নয়। সাপের খোলস দেখেছে।

সাইকেলটা এই হলঘরের সিঁড়ির তলায় কোণার দিকে লুকোনো আছে। যোগেশ্বরের চোখে পড়বে। কাজেই তার রাত কাটানো ছাড়া উপায়ও নেই।

যোগেশ্বর হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন নাকি? হুঁ, নাক ডাকছে।

ব্যাপারটা দেখে কৃত্তিবাস ভাবল একটা চান্স নেওয়া যাক। সে উঠল।

সাবধানে পা বাড়াল। কিন্তু একটা ভাঙা ধাপে পা পড়তেই সেটা মচমচ করে কেঁপে উঠল এবং একগাদা ধুলো-বালি ঝরে পড়ল।

অমনি যোগেশ্বর জেগে গেলেন। আঁতকে উঠে তাকিয়ে রইলেন সিঁড়ির দিকে। ভাঙা বিশাল দরজা জানলা দিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে শেষ রোদের ছটা এসে হলঘরে ঢুকেছে। কাজেই ভেতরে যথেষ্ট আলো রয়েছে এখনও।

পা তুলে কৃত্তিবাস যেই পিছিয়ে গেছে, সেই ফের মচ মচ শব্দ এবং ধুলো-বালি ঝরে পড়ল আরেক দফা।

"এবার যোগেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পকেট থেকে রিভলবার বের করে ফেললেন। দেখামাত্র কৃত্তিবাস দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে সরে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে নিজের আস্তানায় চলে গেল। এই ঘরটায় আসতে হলে একটা বিপজ্জনক ভাঙা অংশ পেরুতে হয়। তাই এখানে ঝট করে কেউ তাকে খুঁজতে আসার রিস্ক নেবে না।

একটু পরে ভয় কেটে গেল কৃত্তিবাসের। যোগেশ্বরের কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিল না। ভয় কেটে ক্রমশ তার রাগ জাগল। তখন জানলার ধারে গিয়ে ইজেলে একটা কাগজ কেটে যোগেশ্বরের সেই ঘুমন্ত শরীরের কার্টুন আঁকতে থাকল।

হলঘরে যোগেশ্বর তখন রিভলবার তুলে সিঁড়ির কাছে এসে চোখ বড় করে ওপরের দিকে তাকিতে আছেন। মুখে চোখে অনেকগুলো ভাব খেলা করছে। কিছু আতঙ্ক, কিছু মরীয়াপনা কিছু রাগ। এবার কোন আওয়াজ হলেই ট্রিগারে চাপ দেবেন। রিভলবারটায় ছটা গুলি ভরা আছে।

বাইরে শর্মিষ্ঠার সাড়া পেয়ে দ্রুত রিভলবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। শর্মিষ্ঠা শুকনো কাঠ এনেছে। বলল, ওখানে কী করছ ?

যোগেশ্বর বললেন, দেখছি।

কী দেখছ ? ভুত নাকি ? শর্মিষ্ঠা হাসল। তারপর কাঠ রেখে দরজার এক পাশে উনুন বানাতে ব্যস্ত হল ইট দিয়ে।

যোগেশ্বর কাছে গিয়ে বললেন, ওরা কোথায় ?

আরও কাঠ চাই না ? মিলুদা গাছে উঠে শুকনো ডাল ভেঙে দিচ্ছে। জলি কুড়োচ্ছে।

যোগেশ্বর শতরঞ্জিতে বসে পড়লেন আগের মত। বললেন, ধোঁয়া হবে না তো ঘরে ?

হোক্ না। শর্মিষ্ঠা বলল। ধরে নাও, এটা ফায়ারপ্লেস।

ফায়ারপ্লেসের চিমনি থাকে। যোগেশ্বর মন্তব্য করলেন।

শর্মিষ্ঠা ওপরে অন্যপাশে জানালা দেখিয়ে বলল, ওইটে আমাদের ফায়ারপ্লেসের চিমনি।

যোগেশ্বর চোখ বুজে বললেন, তাহলে কফি বানাও ঝটপট।...

গাছে চেপে মিলন শুকনো একটা মোটা ডাল ভাঙার চেষ্টা করছিল। নিচে জলি দাঁড়িয়ে আছে। রোদ কমে গেছে। বলল, থাকগে। ছেড়ে দিন. এই যথেষ্ট।

মিলন আরেকবার চাপ দিতে গিয়ে হঠাৎ কী দেখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল!

জলি বলল, কী দেখছেন?

একটা অদ্ভুত লোক।

অদ্ভুত মানে?

মানে ভূতের মত আর কী!

জলি এদিক ওদিক ভয়ের চোখে তাকিয়ে বলল, এই! বলবেন না। ভয় করছে।

মিলন শুকনো ডালটা মড়াৎ করে ভেঙে নিয়ে লাফ দিল। কাঁধে নিয়ে একটা ভঙ্গি করে বলল, আমায় থিয়েটারের ভীম দেখাচ্ছে না?

জলি বলল, কিন্তু আপনার অদ্ভুত লোকটা কোথায়?

ওই দিকে। বলে মিলন পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে ফোয়ারার নারীমূর্তির কাছে গিয়ে ফের বলল লোকটা সত্যি কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

কেন, কেন? জলি প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বোঝা যাচ্ছিল, মুখে যতই বড়াই করুক, ভূতপ্রেতের ভয় তার সামান্য নয়।

মিলন বলল, ওর ব্যাপারস্যাপার কেমন যেন। ঝোপের ভেতর থেকে মুখ বের করে আমাকে দেখছিল। মুখের গড়নটা...নাঃ। এক পলকের দেখা তো। আমারই চোখের ভুল। এক মিনিট। আমি দেখে আসি।

সে পা বাড়ালে জলি বলল, আমি...আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

থাকুন না!

জলি লাজুক ভংগি করে বলল, আমার···আমার কেমন যেন ভয় করছে।

মিলন অবাক হয়ে বলল, আমার ধারণা ছিল মফস্বলের মেয়েরা খুব সাহসী। সর্বনাশ! এই ক্ষুধিত পাষাণের মত পোড়ো-বাড়িতে আপনি তাহলে কী সাহসে এলেন?

এই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

টুপ করে কোত্থেকে একটা ঢিল এসে পড়ল জলির গায়ে! খুবই ছোট্ট ঢিল। আঘাত তত কিছু না, কিন্তু জলি অস্ফুট আর্তনাদ করে মিলনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মিলন ব্যস্ত এবং অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আরে, আরে! কী ব্যাপার?

জলি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ঢিল।

মিলন হো হো করে হেসে উঠল। 'নিশ্চয় শমু দুষ্টুমি করছে। কই, ছাড়ুন তো দেখি। বলে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

জলি তাকে ছাড়ল না। ধরে থেকেই তাকে অনুসরণ করল। ফোয়ারার পাশ দিয়ে কয়েক পা এগোলে ফাঁকা জায়গায় ঘাসের জঙ্গল। তারপর বাড়ির সামনের দিকের সিঁড়ি—যার মাথায় ভাঙ্গা কামান রয়েছে।

শর্মিষ্ঠা ওদের ডাকবে বলে বেরিয়েছিল। আলোর রঙ এখন ধূসর। দূরে কুয়াশার মত গাঢ় হয়েছে আসন্ন সন্ধ্যায় রঙ। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাকতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে।

জলি মিলনকে ঘনিষ্ঠভাবে ছুঁয়ে রয়েছে। মিলন হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বলছে। শর্মিষ্ঠার ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর তার ঠোঁটের কোণাও কুঁচকে গেল। কেমন একটা হাসি ফুটল। যাকে বাঁকা হাসি বলা যায়।

সে দ্রুত হলঘরে গিয়ে ঢুকল।

যোগেশ্বর পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। আলোটা পুরনো। অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। শর্মিষ্ঠা বুদ্ধি করে সঙ্গে এনেছে। ভগু ঠাকুর কেরোসিন পুরে নতুন বাতি পরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু যোগেশ্বর বাগে আনতে পারছেন না। হাঁটু মুড়ে বসে পাম্প করছেন। পিন ঘোরাচ্ছেন। আলো জ্বলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কফি তৈরি হয়ে গেছে। খিঁচুড়ি আর মাংস রান্না হবে। রান্নার দায়িত্ব জলির। মসলাপাতি ভগু ঠাকুর তৈরী করে দিয়েছে। উনুনের পাশে রীতিমত গৃহস্থালির থই থই অবস্থা ততক্ষণে। শর্মিষ্ঠা এসব কাজে ভীষণ আনাড়ি। অথচ পিকনিকের এমন আয়োজনে তার আনন্দ খুব।

মিলন ও জলি ঢুকে দেখল শর্মিষ্ঠার মুখটা গম্ভীর। একবার তাকিয়ে দেখে সে বলল, কাঠ কোথায়?

মিলন তার কাঠটা দেখাল। জলি বলল, ওই যাঃ! আমার কাঠ-গুলো গাছতলায় পড়ে রইল যে।

মিলন হাসতে হাসতে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার। ওঁর গায়ে একটা ঢিল পড়েছে নাকি। সেই ভয়ে উনি কাঠফাঠ ফেলে পালিয়ে এসেছেন।

যোগেশ্বর বললেন, ঢিল? কিসের ঢিল?

জলি চোখ বড় করে বলল, শুধু কি ঢিল? মিলনবাবু একটা ভূতুড়ে চেহারার লোককে দেখেছেন। ঝোপের ফাঁকে মুণ্ডু বের করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছিল।

যোগেশ্বর পাম্প করতে করতে বললেন, হুঁ। জ্বলছে। জ্বলতেই হবে। তারপর কফির কাগুজে কাপে চুমুক দিতে দিতে নিজের জায়গায় গেলেন। পেট্রোম্যাক্স ঘার প্রচুর আলো ছড়াচ্ছে। শোঁ শোঁ একটানা শব্দ হচ্ছে।

মিলন বলল, শমু! টর্চ কোথায়? কাঠগুলো নিয়ে আসি।

শর্মিষ্ঠা নীরবে ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে দিল। মিলন বেরিয়ে গেল।

জলি চাপা গলায় বলল, শমু! এ বাড়িটার যে বদনাম শুনেছিলুম হয়তো সত্যি।

শর্মিষ্ঠা কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে কেমন হাসল।

হাসছ যে? বিশ্বাস হচ্ছে না?

নিশ্চয় হচ্ছে। তবে আমি হলে গল্পটা আরও সাংঘাতিকভাবে বলতুম।

জলি কিছু না বুঝে হেসে ফেলল।

শর্মিষ্ঠা কাপ হাতে বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। বারান্দার বড় বড় থামগুলোর আড়ালে আবছা আঁধারের দিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু সে সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল। জঙ্গলেভরা প্রাঙ্গণে দূরে টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে। মিলন কাঠগুলো নিয়ে আসছে।

যোগেশ্বর ডাকছিলেন, জলি! কাম হেয়ার! তোমার ঢিল এবং অদ্ভুত মুণ্ডুর গল্পটা শুনি।

জলি কাছে গিয়ে বসল।...গল্প নয়, ঠাকুর্দা। বিশ্বাস করুন।

বারান্দায় মিলন শর্মিষ্ঠার গায়ে টর্চ ফেলেছে! শর্মিষ্ঠা বলল, আঃ! কী হচ্ছে?

মিলন বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙছিল। উঠে এসে উত্তেজিত-ভাবে বলল, শমু! শমু! বড় অদ্ভূত ব্যাপার।

শর্মিষ্ঠা বলল, চালাকি কোর না। এক্সপ্লানেশন চাই নি।

কিসের এক্সপ্লানেশন? অবাক হয়ে মিলন বলল। ব্যাপারটা শোন আগে। শুনব না।

কী হয়েছে বল তো শমু?

ভুতে ধরেছে। আঃ! আলো নেভাও।

মিলন আলো নেভাল। আবছা আঁধার জমেছে ইতিমধ্যে। সন্ধ্যা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়েছে। নদীর দিকে গাছপালার ভেতর পেঁচা ডাকল।

মিলন বলল, বাইরে দাঁড়িও না। আমার মত ঢিল খাবে ভুতের হাতে।

বলে সে ভেতরে চলে গেল। কাঠগুলো রেখে দিলে জলি এগিয়ে এসে ওর কফির পেয়ালাটা এগিয়ে দিল। মিলন চাপা গলায় বলল, আমিও ভুতের ঢিল খেলুম এইমাত্র।

সত্যি?

হ্যাঁ। তবে আমার মনে হচ্ছে, কেউ দুষ্টুমি করছে আড়াল থেকে।

বারান্দায় শর্মিষ্ঠাকে দেখা যাচ্ছিল পেট্রোমাক্সের আলোয়। জলি ডাকল, শমু। ভেতরে এস। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।

মিলন বলল, তাস এনেছি ঠাকুর্দা। তাস খেলতে পারেন তো?

যোগেশ্বর বললেন, তাস এনেছ এতক্ষণ বল নি? দাও, দাও। আগে কিছুক্ষণ পেসেন্স খেলে নিই।

এই সময় শর্মিষ্ঠা ছিটকে চলে এসেছে ঘরের ভেতর। হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌ল, টর্চটা দেখি। কেউ ঢিল ছুঁড়ল আমার গায়ে। দেখাচ্ছি মজা।

সে মিলনের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে বেরুল। মিলন তাকে অনুসরণ করল। বাইরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা এদিকে ওদিকে আলো ফেলছিল। কিন্তু কাকেও দেখতে পেল না। মিলন বলল কি? এসব বিশ্বাস্ হল তো?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। কৃত্তিবাস সাবধানে টর্চ জ্বেলে পা বাড়াল। এঘর-ওঘর ঘুরে সিঁড়ির মাথায় এল। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাকাল।

আঃ! কি সুন্দর গন্ধ ছুটেছে রান্নার। জলি রান্না করছে। যোগেশ্বর আর যুবকটি তাস খেলছে। যোগেশ্বরের কলকাতার নাতনি গম্ভীর মুখে বসে উপন্যাস পড়ছে। হাতে টর্চ। হলঘরে প্রচুর আলো ছড়িয়ে পেট্রোমাক্স জ্বলছে।

কিন্তু কৃত্তিবাস ক্ষুধার্ত। খাদ্যের মিঠে গন্ধে তার নোলায় জল আসছে। ইচ্ছে করছে, গিয়ে দলে ভিড়ে যায়। তবু সাহস পাচ্ছে না। তার ওপর যোগেশ্বরের হাতে তখন রিভলবার দেখেছে। সেই থেকে ভয়টা বেজায় বেড়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল, সাইকেল চুলোয় যাক। তাকে যে কোন উপায়ে এখান থেকে বেরুতে হবে। পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে

নামবে। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই দৌড়ে ফুরুৎ করে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে ফের তখনকার মতো মচমচ শব্দ হল। ঝরঝর করে কিছু ধুলোবালি ঝরে পড়ল।

যোগেশ্বর ও মিলন আপনমনে তাস খেলছেন। কানে ঢুকল না আওয়াজ। জলিও রান্নার ঝোঁকে ব্যস্ত। শুনতে পেল না। শুধু শুনল শর্মিষ্ঠা। সে তাকাল এবং বই বুজিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। টর্চটা নিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে গেল।

কৃত্তিবাস সরে গেল ফের শব্দ হল। তখন সাহসী মেয়েটা সিঁড়িতে উঠতে শুরু করল। নিচে কেউ সেটা টের পাচ্ছিল না।

চার

ওপরে উঠতে উঠতে টর্চের আলোয় শর্মিষ্ঠা এক পলক দেখেছিল কৃত্তিবাসকে। কিন্তু ওপরের ঘরে এপাশে ওপাশে আলো ফেলে কাকেও দেখতে পেল না। আর তখন সে ধাঁধায় পড়ে গেল তাহলে কি চোখের ভুল?

তার ভয় করছিল না বললে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু সে একরোখা মেয়ে। প্রথমে বাঁদিকের ঘরগুলো ঘুরে ডানদিকে চলে গেল। বিপজ্জনক হয়ে আছে কোন কোন ঘরের অবস্থা। গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছিল ঘরগুলো। এবার বিপদ হল চিনে বেরিয়ে আসা।

পা বাড়াতে গিয়ে কি একটা শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। আলো ফেলে দেখল, একটা চামচিকে পড়ল এইমাত্র। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে সামনে পড়ে গেছে।

সে একটু দাঁড়িয়ে চামচিকেটাকে দেখে পা বাড়াল। এ ঘরের ছাদটা প্রায় ধসে যাওয়ার অবস্থা। কড়িবরগা বেঁকে গেছে। ভয়ে ভয়ে কিছুটা এগিয়ে সে একটা ঘর পেল। অলো ফেলেই অবাক হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা।

ঘরের ভেতর ছড়ানো অজস্র টুকরো কাগজ জানলার ধারে এক গাদা রঙের টিউব। জলের পাত্র। এক কোণে ইজেলে একটা কার্টুনের মতো ছবি।

ভেতরে চারদেয়ালে আলো ফেলে শর্মিষ্ঠা আরও অবাক হয়ে দেখল অসংখ্য ছবি দেয়ালে আটকানো রয়েছে। অদ্ভুত সব ছবি! ভয়ংকর প্রাণী—মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়। ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার অবচেতনা থেকে একটা আতংক জেগে মনের চেতন অংশকে গ্রাস করছিল ক্রমশঃ।

এই সময় বাইরে শনশন শব্দ করে বাতাস উঠল। বাতাসটা বাড়তে থাকল। তারপর দমকে দমকে সেই বাতাস ঘরে ঢুকলো। টুকরো কাগজগুলো উড়তে শুরু করল। বাইরে গাছপালার শনশনানি, ঘরে কাগজ ও ধুলো উড়ছে, দেয়ালের ছবিগুলো কাঁপছে। ছবির প্রাণীগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠছে যেন। একেকটি ভয়ংকর মুখ নড়ছে গর্জন করার ভংগিতে। বিকট তাদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন! শর্মিষ্ঠার চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠেছিল। বুকের ভেতর কী এক অজানা আতংক হৃদ্‌পিণ্ডকে নাড়া দিচ্ছিল। টর্চের আলো কাঁপছিল তারপর ছবির ভয়ংকরেরা যেন ছবি থেকে ঝাঁপ দিয়ে মুখব্যাদান করে তার ওপর পড়তে চায় টের পেয়ে শর্মিষ্ঠা আর নার্ভ ঠিক রাখতে পারল না। সে বোবায় ধরা গলায় একটা চাপা চিৎকার করে উঠল। তার মাথা ঘুরে গেল। হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল।

পড়ে যাবার মুহূর্তে কেউ পিছনে তাকে ধরে ফেলতেই শর্মিষ্ঠার আচ্ছন্নতা কেটে গেল। সে শক্ত মনের মেয়ে। ছিটকে সরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মেঝের টর্চটা কাত হয়ে জ্বলছে। শর্মিষ্ঠা দেখল একটি যুবক কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

শর্মিষ্ঠা টর্চটা দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে তার আপাদমস্তক দেখে বলল, কে আপনি? কৃত্তিবাস অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাইনি।

শর্মিষ্ঠা ধমকের সুরে বলল, আপনি কে?

মানুষ। ভূতপ্রেত নই, সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

এই ছবিগুলো আপনি এঁকেছেন ?

ওই একটু অভ্যাস আর কি।

নাম কি ? কোথায় থাকেন ? এখানে এই পোড়ো বাড়িতে ছবি আঁকেন কেন ?

একে একে জিগ্যেস করুন। জেরা করলে জবাব দেওয়া কঠিন।

শর্মিষ্ঠা ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। বলল, বেশ। আগে নাম বলুন।

কৃত্তিবাস মুখার্জি। থাকি ওই শহরে—যেখানে আপনার দাদুর বাড়ি। আর এই পোড়ো বাড়িতে এসে ছবি আঁকার কারণ, নিরিবিলি ছবি আঁকতে ভাল লাগে।

শর্মিষ্ঠা আলাপের সুরে বলল, আপনার টেস্ট আছে। প্রশংসা করা যায়। কিন্তু এমন ভয় দেখানো ছবি আঁকেন কেন ?

পৃথিবীকে আমি প্রচণ্ড ভয়ের জায়গা মনে করি বলে।

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল। কিন্তু ওইসব বিদঘুটে জন্তুগুলো কোন পৃথিবীর বাসিন্দা বলুন তো ? ওদের তো এ পৃথিবীতে দেখা যায় না।

এই পৃথিবীতেই দেখা যায়। লক্ষ্য করে দেখুন—বুঝতে পারবেন। হঠাৎ দেখে ভয় পাবেন—পেয়েছিলেনও। সেটা বুঝতে পারেন নি বলে। এবার দেখুন, প্রত্যেকটি মুখ আপনার চেনা মনে হবে।

কৃত্তিবাস সিগারেট ধরাল। শর্মিষ্ঠা ঘুরে-ঘুরে ছবিগুলো ফের দেখতে শুরু করল। কিন্তু এবার সে ভয় পাচ্ছিল না। বরং হাসি পাচ্ছিল তার। ইজেলের সামনে গিয়ে কার্টুনটা দেখেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, এ কী ! কাকে এঁকেছেন ?

কৃত্তিবাস এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাল করে দেখলে চিনতে পারবেন।

শর্মিষ্ঠা জোরে হাসল ···চিনেছি। দাদু ! কখন আঁকলেন ?

সন্ধ্যার আগে উনি যখন হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন।

শর্মিষ্ঠা এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বলল, আশ্চর্য মানুষ তো আপনি। উঁকি মেরে দেখছিলেন বুঝি ? দাদু দেখতে পেলে

কিছু না বুঝে গুলি ছুঁড়ে বসত জানেন? আপনি আলাপ করতে গেলেন না আমাদের সঙ্গে?

কৃত্তিবাস বলল, সেটাই সমস্যা।

কী সমস্যা বলুন তো?

বলতে গেলে সময় লাগবে।

লাগুক। শুনব।

আপনার টর্চটার আলো কমে আসছে। নিবিয়ে রাখুন।

শর্মিষ্ঠা টর্চ নেভাল। বলল, এবার বলুন।

কৃত্তিবাস বলল, বরং ছাদে চলুন না। চমৎকার জায়গা। ভাল লাগবে আপনার।

শর্মিষ্ঠা বলল, কিন্তু এতক্ষণ হয়তো আমার জন্য ওরা হৈ-চৈ বাধিয়েছে।

কৃত্তিবাস হাসতে হাসতে বলল, বাধাক না। লুকোচুরির এমন চান্স ছাড়বেন কেন?

ঠিক বলেছেন। চলুন।…

পা বাড়িয়ে শর্মিলা ফের বলল, আচ্ছা, আপনি যে এ বাড়িতে রাত কাটান, ভূত-প্রেত দেখেন নি কখনও?

আমি তো রাতে এখানে থাকি না। ভূত না দেখলেও ভূতের ভয় আমার প্রচুর।

আজ আছেন কী সাহসে তাহলে?

সেটাই বলব। ছাদে চলুন। হ্যাঁ, সাবধানে আসবেন। বরং টর্চটা আমায় দিন।

শর্মিষ্ঠা ওকে টর্চ দিল।…

হলঘরে যোগেশ্বর ও মিলন তাসে মগ্ন। মাঝে মাঝে তাস জিতে যোগেশ্বর বাচ্চা ছেলের মত ফিকফিক করে হাসছেন। মিলনের মন কিন্তু জলির দিকে। বারবার আড়চোখে অদূরে জলির দিকে তাকাচ্ছে।

জলিও সাবধানে তাকাচ্ছে। সেটা প্রেমে হয়তো নয়, খেয়ালে। কিংবা সুন্দর যুবকের দিকে লুকিয়ে তাকানোর ইচ্ছা যুবতীদের পক্ষে

স্বাভাবিক। জলি টের পেয়েছে, সে মিলনকে তখন ওইভাবে জড়িয়ে ধরেছিল এবং তার গা ঘেঁষে আসছিল, সেটা শর্মিষ্ঠার চোখে পড়েছে। তাই শর্মিষ্ঠার মুখটা কেমন গম্ভীর।

ঘাড় ঘুরিয়ে শর্মিষ্ঠাকে দেখতে চাইল সে। কিন্তু দেখতে পেল না। ভাবল, তাহলে নিশ্চই কামানটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শর্মিষ্ঠার সাহস যে আছে, তা সে জানে। আজও টের পেয়েছে তা।

জলি একবার নির্ভয়ে মিলনের দিকে তাকাল। মিলনও তাকাল। দুজনেই কারণে বা অকারণে একটু হাসল।

যোগেশ্বর ডাকলেন, শমু! জলি! তোমাদের রান্না হয়ে থাকলে চলে এস। আমরা ব্রে খেলব। নৈলে জমছে না।

মিলন ঘুরে দেখে বলল, শমু কোথায় গেল? শমু!

যোগেশ্বরও ডাকলেন, ও শমু! কোথায় গেলি?

কোন সাড়া এল না। জলি বলল, রাগ করেছে নাকি? হয়তো বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিলন বলল, কী সর্বনাশ! সে তক্ষুণি উঠে হন্ত-দন্ত বেরিয়ে গেল। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে দেখতে পেল না। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। চৈত্ররাতের উদ্দাম বাতাস বইছে। গাছপালা ঝোপঝাড় দুলছে।

জলি ডাকল, মিলনবাবু! কী করছে শমু?

মিলন ফিরে এসে বলল, আশ্চর্য মেয়ে তো! আপনার কাছে টর্চ আছে? শমু টর্চ নিয়ে কোথায় গেল হঠাৎ?

জলি টর্চ দিয়ে একটু হেসে বলল, শমু নিশ্চয় ভূতের খোঁজে বেরিয়েছে।

মিলন বাইরে গিয়ে প্রাঙ্গণ ও বাগানে টর্চের আলো ফেলে কয়েক-বার ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পেল না। ফিরে এল হলঘরে। বলল, কোথায় গেল ও?

যোগেশ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, সে কী! গেল কোথায়? হতচ্ছাড়া মেয়েটা···

জলি বলল, মিলনবাবু, ভূত দেখবে বলে দোতলায় ওঠেনি তো?

ওর বড্ড ডানপিটেমি আছে। আমি জানি।

যোগেশ্বর বললেন, মরবে। নির্ঘাৎ মরবে তাহলে। ভূতে ঘাড়টি মটকে দেবে যখন, তখন বুঝবে ঠ্যালা! আমার কী? আমি পেসেন্স খেলতে বসলুম। যা বোঝ, করো সব।

মিলন বলল, দোতলাটা খুঁজে দেখা দরকার। বলে সে জলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? একা কেমন যেন লাগছে—মানে তখন ঢিল খাওয়ার পর থেকে ভূতে বিশ্বাস দানা বাঁধছে।

ওর চোখে দুষ্টুমি খেলা করছিল। জলি বলল, আমারও। তা বলছেন যখন, যাব।

যোগেশ্বর তাস সাজাতে সাজাতে বললেন, বন্দুকটা নিয়ে যাও ভায়া।

মিলন বলল, থাক।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতালায়। মিলনের গা ঘেঁষে পা ফেলছিল জলি। তিনটে ঘর খুঁজে যেখানে পৌঁছল, সেখানটা চওড়া একটা ব্যালকনি মতো চাতাল। অনেকগুলো থাম রয়েছে। মিলন বলল, কোথায় গেল শমু?

এই সময় কোথায় ঘষ ঘষ আওয়াজ হল। একটা ঘষটানোর শব্দ। শোনামাত্র জলি মিলনকে জড়িয়ে ধরল। মিলন বলল, এত ভয় কেন আপনার?

জলি ফিসফিস করে বলল, ও কিসের শব্দ?

মিলন হাসল। শমু ভয় দেখাচ্ছে না তো আমাদের?

জলি সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে বলল, বলা যায় না।

চলুন, দেখি—শব্দটা ওদিকেই শুনলুম মনে হল।

দুজনে আবার এগোল। চত্বর ঘুরে আবার একটা ঘর। ঘরের পর ঘর। ভাঙাচোরা অবস্থা প্রত্যেকটার। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে কোত্থেকে। জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলার মত। জলি চমকে উঠে বলছে, ও কি? মিলন বলছে, বাতাসের শব্দ।

দক্ষিণের শেষ ঘরটায় পৌঁছে মিলন বলল, আশ্চর্য! শমু গেল

কোথায় বলুন তো ?

জলি বলল, চলুন। ওপরে আসেনি নিচে কোথাও আছে। নিচের তলাতেও তো অনেক ঘর আছে।

দুজনে হলঘরের সিঁড়ির মাথায় এসেছে। এমন সময় নিচে গুড়ুম করে শব্দ হল। বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর যোগেশ্বরের গলা শোনা গেল। কাম অন ! কাম অন ইউ স্কাউণ্ড্রেল !

দুজনে সিঁড়িতে হন্তদন্ত হয়ে নামতে থাকল। মিলন বলল, কি ব্যাপার ঠাকুর্দা ? কাকে গুলি করলেন ?

যোগেশ্বর রিভলবার হাতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, কেউ ফোঁস ফোঁস করছিল ওপাশে। হুঁ, পেলে শমুকে ?

না তো।

বড্ড দুষ্টু মেয়ে, বুঝলে ? যোগেশ্বর রিভলবার পকেটে পুরে বললেন। বরাবর ওইরকম। মরুক গে, আমার কী ! তবে ভূত হোক আর যেই হোক, আমায় ভয় দেখালেই আমি গুলি ছুঁড়ব।

মিলন বলল, আমার দৃঢ় ধারণা, শমু আমাদের ভয় দেখাচ্ছে দুষ্টুমি করে।

জলি সায় দিয়ে বলল, ঠিক তাই।

যোগেশ্বর অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করলেন। পায়চারি করতে করতে বললেন, এমন করবে জানলে কক্ষনো আনতুম না। একে আমার অমূল্য জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেল, সেই নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে আছে। তার ওপর গাড়িটা বিগড়ে পড়ে রইল বন-বাদাড়ে। এতক্ষণ ওটাও চুরি গেল কিনা কে জানে ! এদিকে হতচ্ছাড়া মেয়েটার বাঁদরামি। আর কক্ষনো ওর কথা শুনব ভেবেছ ? নেভার, নেভার।

মিলন জলির দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন না। নিচে তলার ঘরগুলো খুঁজে দেখি। শমু যদি লুকোচুরি খেলতে চায়, আমরাও খেলব !

জলি বলল, চলুন।...

ছাদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে শর্মিষ্ঠা ও কৃত্তিবাস গুলির শব্দ খুব আবছা ভাবে শুনেছিল। কিন্তু আমল দেয়নি। ছাদে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে তার ফলে অন্য কোন শব্দ কানে আসার কথা নয়।

সব শোনার পর শর্মিষ্ঠা হেসে খুন। বলেছিল, আপনার সমস্যা ভারি অদ্ভুত।

কৃত্তিবাস বলেছিল অদ্ভুত হলেও এটাই আজকাল স্বাভাবিক।

শুনুন, আপনি কলকাতা যাবেন?

কেন?

বাবাকে বলে আপনাকে কোন কমার্শিয়াল ফার্মে কাজ পাইয়ে দিতে পারি। ধরুন, কোন এ্যাডভার্টাইজিং কনসার্নে। আপনি এত ভাল আঁকেন।

চেষ্টা করব যেতে।

চেষ্টা নয়। আমাব সঙ্গেই চলুন না। পরশু আমি ফিরব।

উঠব কোথায়?

আমাদের ওখানে। সে-সব ভাববেন না। শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়েছিল এতক্ষণে। এবার চলুন, আপনাকে ওদের সামনে হাজির করি। আপনার নিশ্চই ক্ষিদে পেয়েছে।

কৃত্তিবাস বলেছিল, পেয়েছে। বিশেষ করে সুন্দর গন্ধে।

দুজনে হাসতে হাসতে নেমেছিল। তারপর কৃত্তিবাসের ছবির ঘরে এসেছে, এমন সময় নিচে চাপা ফোঁস ফোঁস শোনা গেল। দুজনেই চমকে উঠে বলল, ও কিসের শব্দ?

শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। শর্মিষ্ঠা ইজেল থেকে যোগেশ্বরের কার্টুনটা নিল। তারপর দুজনে ফের চলতে শুরু করল। আগে কৃত্তিবাস, পেছনে শর্মিষ্ঠা। হলঘরের ওপর এসে সিঁড়ির কাছে ঝুঁকে কৃত্তিবাস ফিসফিস করে বলল, আপনার ঠাকুর্দা একা তাস খেলছেন। ব্যাপার কী? ওঁরা গেলেন কোথায়?

শর্মিষ্ঠা শক্ত মুখে বলল, অভিসারে গেছে। আবার কোথায় যাবে?

কৃত্তিবাস আস্তে বলল, যাঃ। কী যে বলেন! হয়তো আপনাকে

খুঁজতে বেরিয়েছে ?

শর্মিষ্ঠা শব্দ তুলে সিঁড়িতে নামতে থাকল। যোগেশ্বর মুখ তুলেছেন। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছেন। শর্মিষ্ঠা ঘুরে দেখল, কৃত্তিবাস দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, দাঁড়িয়ে কেন ? আসুন না।

যোগেশ্বর বললেন, হুঁ। ছিলে কোথায় ? ভূতের আড্ডায় বুঝি ?

বলেই কৃত্তিবাসের দিকে চোখ পড়ল। তাকিয়ে রইলেন। ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন যোগেশ্বর। কৃত্তিবাস করজোড়ে নমস্কার করে বলল, নমস্কার স্যার।

যোগেশ্বর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি কে হে বাপু ?

আমি কৃত্তিবাস—মানে,

শর্মিষ্ঠা আলাপ কারানোর ভঙ্গিতে নামধাম জানিয়ে দিল। যোগেশ্বর বললেন, তা ওহে কৃত্তিবাস। এ পোড়োবাড়িতে কি ভুতুড়ে রামায়ণ লিখতে বসেছ ? ভূতায়ন ?

শর্মিষ্ঠা ধমকের সুরে বলল, আঃ দাদু। অভদ্রতা করো না। ইনি একজন আর্টিস্ট। চমৎকার ছবি আঁকেন।

কী ? ছবি ? যোগেশ্বর প্রশ্ন করলেন। কিসের ছবি ? ভূতের ?

কৃত্তিবাস সবিনয়ে বলল, ঠিক বলেছেন। ভূতের ছবি আঁকি।

এই যে, এখানে বসো। যোগেশ্বর শতরঞ্জির একপাশটা দেখিয়ে দিলেন। দেখ বাবু, ভূতের ছবি আঁকতে সবাই পারে। মানুষের ছবি আঁকাটা সহজ নয়। একটা গোল্লা এঁকে ভূতের মুণ্ডু করে ফেল। নাক চোখ দাঁত, বড় বড় কান এঁকে দাও। এই যে এভাবে। খুব সোজা।

পকেট থেকে ডাইরি বের করে ডটপেনে ভূতের মূর্তি একে দেখিয়ে দিলেন।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে সেই কার্টুনটা দেখিয়ে বলল, দেখ তো এ কার ছবি ?

যোগেশ্বর দেখতে থাকলেন। বললেন, চেনাচেনা মনে হচ্ছে। অথচ বেয়াড়া ভুতুড়ে চেহারা। নিশ্চয় মামদো ভূতের ?

কৃত্তিবাস লজ্জায় পড়ে গেছে। কাঁচুমাচু মুখে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

শর্মিষ্ঠা বলল, ওটা তোমার ছবি দাদু। চিনতে পারছ না?

হোয়াট? যোগেশ্বর খাপ্পা হয়ে বললেন।

কৃত্তিবাস কী বলতে যাচ্ছে এমন সময় ওপাশের ঘরে ধুপধুপ শব্দ শোনা গেল। তারপর টর্চের আলো ঝলসে উঠল। মিলন ও জলি দৌড়ে এসে হলঘর ঢুকল। দুজনেই হাঁফাচ্ছে।

মিলন শর্মিষ্ঠাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। শর্মিষ্ঠা মুখ টিপে হেসে বলল, ভূতে তাড়িয়েছে বুঝি?

জলি হাঁফাতে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার! তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ টর্চের আলোয় দেখি, একটা মড়ার খুলি গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মিলন বলল, স্বচক্ষে দেখলুম। দরজা দিয়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে ঢুকল।

কৃত্তিবাস বলল, মড়ার খুলি? কিন্তু মড়ার খুলি তো....

মিলন বাধা দিয়ে বলল, আপনাকে তো চিনলুম না?

শর্মিষ্ঠা বলল, উনি কৃত্তিবাস মুখার্জি। বিখ্যাত পেণ্টার। উনি এ বাড়িতেই একটা স্টুডিও করেছেন। নিরিবিলি জায়গা ছাড়া ইমাজিনেশন খোলে না। ব্যস, আর কী জানতে চাও?

কৃত্তিবাস বলল, শর্মিষ্ঠা, আপনার টর্চটা দিন তো—আসছি!

শর্মিষ্ঠা বলল, কোথায় যাবেন?

আমার ঘরে।

কেন?

আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। বলে হাত বাড়িয়ে টর্চ নিল কৃত্তিবাস।

শর্মিষ্ঠা বলল, ব্যাপারটা কী?

ফিরে এসে বলব। কৃত্তিবাস চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তার ঘরে মড়ার মাথা ছিল। মডেল হিসেবে রাখা আছে। সেই খুলি নিচের তলায় জ্যান্ত হয়ে গড়িয়ে বেড়ানোর মানেটা কী?

কৃত্তিবাস তার ঘরে গিয়ে দেখল, খুলিগুলো একটাও নেই। কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে—নাকি সত্যি ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটেছে?

একা ঝোঁকের মাথায় এসে সে এবার খুব ভয় পেয়ে গেল। তক্ষুনি

হন্তদন্ত ফিরে চলল শর্মিষ্ঠাদের কাছে।

আবার সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। হলঘরে যোগেশ্বর বাদে সকলের মুখে উত্তেজনার ভাব। যোগেশ্বর বললেন, বাতাসের শব্দ। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসলে আমারই ভুল হয়েছিল তখন। এ বাড়িতে এমন সব বিদঘুটে শব্দ সেবার আমরা শুনেছিলুম। ডাকাত ধরতে এসেছিলুম। যেবার।

আচমকা কোথাও ঠং ঠং করে কী যেন পড়ে গেল। তারপর খ্যাং খ্যাং করে ক্যানেস্তারা পেটাতে থাকল কেউ। জলি আতংকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। মিলন ফিস ফিস করে বলল, কৃত্তিবাসবাবু ওপরের ঘরে কিছু করছেন হয়তো।

জলি বলল, না না। মনে হচ্ছে এই নিচের তলায় শব্দটা হচ্ছে।

মিলন কান পেতে শুনে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে।

শর্মিষ্ঠা বন্দুকটা তুলে নিয়ে বলল, জলি, তোমার টর্চটা দাও। আমি দেখে আসি।

জলি বলল, না, না। যেও না শমু!

যোগেশ্বর ফের তাসের সামনে বসেছেন ততক্ষণে। তাস চালতে চালতে বললেন, ওকে বাধা দিও না। যাক। ভূতের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে আসুক। ঠেলাটা টের পাবে'খন।

টর্চ নিয়ে, বন্দুক বাগিয়ে শর্মিষ্ঠা চলে গেল পাশের ঘরে—যেদিকে শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ঠং ঠং শব্দ থেমে গেল হঠাৎ। শুধু ফোঁস শব্দ থামল না। শর্মিষ্ঠা সাবধানে এগোল। পরের ঘর পেরিয়ে পরেরটাতে যেতেই সে টর্চের আলোয় দেখল, মেঝেয় একটা মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখামাত্র চমকে উঠেছিল। তারপর সামলে নিল। নির্ভয়ে খুলিটাকে লাথি মারল। তারপরই শুরু হয়ে গেল একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড।

কড় কড় কড়াৎ করে মেঘ ডাকল। বাইরে থেকে সেই দমকা হাওয়া চৌগুণ বেড়ে গেল হঠাৎ। খোলা দরজা জানলা দিয়ে ঘূর্ণী ঝড়

ঢুকল শনশনিয়ে। ধুলোবালি উড়ল। ঘুরপাক খেতে থাকল ধুলো-বালির সঙ্গে পোড়োঘরের টুকরোটাকরা সব আবর্জনা। আবার মেঘ ডাকল। বিদ্যুতের ছটা মুহুর্মুহু ঘরের ভেতর তীব্র তীক্ষ্ণ একটা সাদা ও নীল রেখা টেনে মিলিয়ে যেতে থাকল। নন্দন কাননের অশরীরীদের ঘুম ভেঙে গেছে যেন। অদ্ভুত শব্দ সারা বাড়িতে। কোথাও কিছু পড়ে যাওয়ার, কিছু ঘষটে নিয়ে যাওয়ার, ঠং ঠং, ঘষ ঘষ, ফোঁস ফোঁস, দড়াম্ দড়াম্ কর রর কট্ কট্ কট্ কট্…ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট্…ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্…

ঘরের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া ধুলোবালির মধ্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। তার পরনের শাড়ি কিছুটা লেপ্টে গেছে গায়ে, কিছুটা পালের মত উড়ছে। হকচকিয়ে যাওয়ার ফলে টর্চের বোতাম থেকে আঙুল সরে গেছে। টর্চটা গেছে নিভে।

সে ফের টর্চের বোতাম যেই টিপেছে এবং আলো জ্বলেছে, আচমকা পেছন থেকে কেউ তার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিল। এবং বন্দুকটাও।

তারপর কেউ অমানুষিক একটা হাসি হাসতে হাসতে অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে গেল। এমন ভয়ংকর, বিদঘুটে, নাকিস্বরের হাসি শর্মিষ্ঠা কখনও শোনেনি।

সেই মুহূর্তে যোগেশ্বর, মিলন ও জলির ডাক শুনতে না পেলে সে তখনকার মতো পড়ে যেত।

ওরা ডাকছিল শমু! শমু! শমু! ফিরে এস!

বাইরে ঝড়ই বটে। বারবার মেঘ ডাকছে। কালবোশেখী এসে গেছে সবার অলক্ষ্যে। বছরের এ সময়টাতে ঝড় আর শিলাবৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু শর্মিষ্ঠার মনে তখন দুঃস্বপ্নের আচ্ছন্নতা। বোবা-ধরা গলায় সে চেঁচিয়ে ডাকার চেষ্টা করছিল ওদের। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে সে হন্যে হচ্ছিল।

তারপর বিদ্যুত ঝিলিক দিল ফের। মেঘের ডাকে বাড়ি কেঁপে উঠল। সেই চকিত আলোয় শর্মিষ্ঠা যে দরজাটা দেখতে পেয়েছিল, আন্দাজ করে সেদিকে এগিয়ে গেল। এমনি করে একঘর থেকে আরেক

ঘরে ঢুকল। কিন্তু হলঘরটা কোনদিকে বুঝতে পারল না। ও ঘরে উজ্জ্বল আলো থাকার কথা।

আবার পা বাড়াল শর্মিষ্ঠা। এ ঘরে ঝড় ঢুকছে না। হয়তো একেবারে বাড়ির মাঝখানের ঘর। বিদ্যুতের ঝিলিকও আসছে না। অন্ধের মতো হেঁটে শর্মিষ্ঠা কোথায় চলেছে, ঠাহর করতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে আচমকা সে কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার ওপর পড়ে গেল। অস্ফুট স্বরে কে কে বলে উঠল শর্মিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক টর্চ জ্বলেই নিভে গেল।

কৃত্তিবাস ফিসফিস করে বলে উঠল, চুপ। আমি কৃত্তিবাস।...

রাতের কালবোশেখী হলঘরের বড় বড় দরজাজানালা খোলা পেয়ে তুলকালাম বাধিয়েছে ততক্ষণে। প্রথম ধাক্কাতেই পেট্রোম্যাক্স বাতিটা গেছে নিভে। জ্বালানোর চেষ্টা করেও কিছু হয় নি। তখন যোগেশ্বর পাম্প খুলে দিয়েছেন। উনুন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার উড়তে শুরু করেছিল বলে জল ঢেলে নেভানো হয়েছে। মুখঢাকা প্ল্যাস্টিকের মস্তো বালতিতে অনেকটা জল ছিল। খাবার সময় টানাটানি পড়তে পারে।

ঘরে এখন অন্ধকার। সে অন্ধকার চিড় খাচ্ছে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিলিকে। চোখ খোলা যায় না ধুলোবালির উপদ্রবে। তার সঙ্গে সেই সময় হুতুড়ে আওয়াজ। শর্মিষ্ঠাকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যায় নি। কিন্তু সঙ্গে আর টর্চ নেই। অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে তিনজনে। যোগেশ্বরের সাড়াশব্দ নেই। মিলন ও জলি গা ঘেঁষে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে।

তারপর বৃষ্টির ছাঁট হলঘরে ঢুকতে লাগল। মেঘগর্জনের সঙ্গে শুরু হয়েছে জোরালো বৃষ্টি। বাইরের জঙ্গল থেকে ছেঁড়াপাতা আস্ত ডালসুদ্ধ এসে ছিটকে ঘরে ঢুকছে। নন্দন কানন থরথর করে কাঁপছে প্রকৃতির হঠকারী উপদ্রবে।

কতক্ষণ পরে ঝড়টা কমে গেল। তারপর বৃষ্টিটাও ধরে এল। তখন যোগেশ্বর বললেন, মিলু, আলোটা খুঁজে নিয়ে এস। তুমি

জ্বালাতে পারবে না, আমাকে দিও। চেষ্টা করে দেখব'খন। মনে হচ্ছে, বৃষ্টির জল ঢুকে ম্যাণ্টেলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

মিলন দেশলাই হাতড়াচ্ছিল। বলল, কী মুশকিল। দেশলাইটা কোথায় গেল ?

জলি বলল, পেট্রোম্যাক্সের কাছেই পড়ে আছে হয়তো।

ব্যস্! তাহলে আর আলো জ্বলবার আশা নেই। ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। বলে মিলন অন্ধকারে কতকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগোল।...

একটা জানালা ইঁট সাজিয়ে কেউ অনেকটা ঢেকে রেখেছে। জানলার চৌকাঠ বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেই ইঁটের ফাঁকে কৃত্তিবাস ও শর্মিষ্ঠা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলো খুব কম। কারণ লণ্ঠনের কাঁচে ঘন কালি জমেছে।

কিন্তু আলো যত কম হোক, ভেতরের ব্যাপারটা দেখতে এবং বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

দুটি লোক মহানন্দে খেতে বসেছে এবং মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসছে। চাপা গলায় অল্পসল্প কথাবার্তাও বলছে।

খাচ্ছে খিচুড়ি এবং মাংসের ঝোল। থালা-টালার বালাই নেই। দুটি এনামেলের ডেকচি থেকে দুজনে তুলে তুলে খাচ্ছে।

একজন প্রৌঢ়, অন্যজন যুবক। দুজনের চেহারাই ভূতুড়ে। নোংরা। জলে ভেজা। কাদাও লেগেছে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় লোকটা বলল, ভুতো। কেমন খাচ্ছিস ?

দারুণ মামা। উকিল বাবুর মেয়ে খাসা রাঁধে।

ঝটপট খেয়ে নে। কাজে লাগতে হবে।

ও মামা! ওরা এতক্ষণ টের পেয়ে গেছে হয়তো।

কী রে ?

রান্না চুরি। বলে ভুতো খিক খিক করে হাসতে লাগল।

প্রৌঢ় লোকটাও অদ্ভুত হেসে বলল, টের পেলে কী হবে? ওরা বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। বুঝলি?

কিন্তু ওরা তো পালিয়ে গেল না মামা?

পালাত। জলঝড় এসে গেল যে!

ঠিক বলেছ।...বলে ভুতো ঢেকুর তুলল। তার পেট ঢোল হয়ে গেছে। সে একটা এনামেলের ঘটি থেকে জল খেতে লাগল।

মামা বলল, সবটা খাসনে। আর জল নেই। আমার জন্যে রাখিস।

অনেক আছে, মামা।

শোন, হাপরে আগুন নিভে গেল নাকি ছাখ। বাকি মালগুলো গলাতে হবে।

ভুতো হাপরে বাতাস ভরে আগুন চাঙ্গা করতে ব্যস্ত হল। ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছিল হাপরে।

বোঝা যায়, খুব আয়োজন করে গেরস্থালি সাজানোর মত এঘরে আড্ডা করেছে ওরা। আশেপাশে পড়ে রয়েছে কংকালগুলো। শর্মিষ্ঠা দেখেই চিনেছে, যোগেশ্বরের সম্পত্তি সবই। এতক্ষণ হামলা করে ফেলত। কৃত্তিবাস ওকে আটকে রেখেছে।

মামা ফের বলল, তবে মাঝখান থেকে একটা বন্দুক লাভ হয়ে গেল।

ভুতো বলল, একটা টর্চও! কিন্তু গুলি কোথায় পাবে মামা?

যোগাড় করে ফেলব দেখিস।...মামাচোর ঢকঢক করে জল খেল। ফের বলল, জিনিসগুলো গলিয়ে বেচেখুচে দিয়ে অনেক টাকা পাব। বুঝলি ভুতো? তারপর এখানেই স্থায়ী আস্তানা করব। নদীর চরে হাঁস শিকার করব বন্দুকে। রাজার হালে থাকব দেখবি।

ভূতো বলল, কেউ যদি টের পায়, মামা?

কেউ টের পাবে না। যে এখানে আসবে, ভূতের ভয় দেখাব। ব্যস।....মামাচোর সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসল। দেখলিনে অতগুলো লোককে কেমন ভয় পাইয়ে দিলুম?

মামা হাপরের পাশে এসে বসল। হুঁ, আগুন হয়েছে। তবে

বুঝলি? আরও কাঠকয়লা যোগাড় করতে হবে। হলঘরে ওরা কাঠ পুড়িয়েছে অনেক। সকালে নিয়ে আসব।

হঠাৎ ভুতো ফিক করে হাসল। ও মামা! একটা কথা ভাবছিলুম।

কী রে?

একখানা মোটরগাড়ি থাকলে খুব জমত।

আছে তো!

কেন, পুলিসবাবুর গাড়িটা! শেষ রাত্তিরে ওটা সারিয়ে ফেলব বরং। তারপর জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসব। গতিক বুঝলে ওই গাড়িতে চেপে হাওয়া হয়ে যাব। প্যালানটা (প্ল্যান) কেমন বলদিকি ভুতো?

দারুণ মামা, দারুণ! ভাগ্যিস তুমি মেকানিকস হতে পেরেছিলে!

মাথায় অনেক রকম প্যালান আসছে, বুঝলি বাবা? কোনটা কাজে লাগবে, বুঝতে পারছিনে। কই, রেকাবগুলো এগিয়ে দে।...

ঠিক এই সময় কৃত্তিবাস এক লাফে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। শর্মিষ্ঠাও অনুসরণ করল। ওপাশের দরজায় গিয়ে কৃত্তিবাস একটু হেসে বলে উঠল, বঙ্কুমামা, কেমন আছো?

মামাচোর বঙ্কুবিহারী ছোট-ছোট চোখে নিষ্পলক তাকাল। পাথরের মূর্তি যেন। ভুতো যে রে! খবর কী? কৃত্তিবাস ভুতোর দিকে পা বাড়াল।

ভুতো ছিটকে সরে গেল. তারপর ওদিকের জানালায় রাখা ইট-গুলোতে একরকম ঢুঁ মেরে চলে গেল ওপারে। ইটগুলো গড়িয়ে পড়ল হুদ্দাড় শব্দে। তার মাথাও হয়তো কাটল।

বঙ্কুবিহারীর সম্বিত জাগতেই বন্দুকের দিকে হাত বাড়িয়েছে। শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বলল, ওতে গুলি নেই।

অমনি বঙ্কু হেরিকেনটা নিভিয়ে দিল। তারপর অন্ধকারে শর্মিষ্ঠা ও কৃত্তিবাসের মাঝখান দিয়ে গুলতির মত বেরিয়ে গেল।

কৃত্তিবাস টর্চ জ্বেলে আর তাকে দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ পরে।

পেট্রোম্যাক্স বাতিটা অনেক চেষ্টায় জ্বলেছে। সেই বাতির উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে যোগেশ্বর তাঁর চুরি যাওয়া জিনিসগুলো দেখছিলেন।

জলি ও শর্মিষ্ঠা চোরের আস্তানা এই প্রথম দেখেছে। তারা ভারি অবাক হয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে। ময়লা হেরিকেন, মিস্তিরিদের টুকিটাকি যন্ত্রপাতি, হাপর এইসব। পিকনিকের রান্নাটা বরবাদ। চোরদ্বয় ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিল, ডেকচি দুটো চেঁছেমুছে সাবাড় করেছে।

ওদিকে কৃত্তিবাস আর মিলন গেছে গাড়িটা চোরেরা নিয়ে গেছে নাকি দেখতে বঙ্কুবিহারী পাকা মিস্তিরি। সুতরাং সে আশঙ্কা ছিল।

এক সময় ওরা ফিরে এসে জানাল, গাড়িটা সেখানেই আছে। এখন বড্ড জলকাদা ওখানে। গাড়ি উদ্ধার করার সমস্যা হবে।

যোগেশ্বর বললেন, সকাল হতে দাও। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ওই ব্যাটা বঙ্কা আর তার ভাগ্নে ছোকরারও সদ্গতি করে ফেলব। বাঘের ঘরে ঘোগ—সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকেছিল। কী স্পর্ধা ব্যাটা-চ্ছেলেদের!

শর্মিষ্ঠা বলল, কিন্তু এভাবে রাত কাটাব নাকি আমরা?

কৃত্তিবাস বলল, ন মাইল রাস্তা হাঁটতে পারবেন না। বরং হলঘর থেকে শতরঞ্জি আর সব জিনিসপত্র এখানে বয়ে নিয়ে আসি। এখানেই শুয়ে পড়া যাবে। আসুন, মিলনবাবু!

যোগেশ্বর তাঁর অপহৃত তাম্রফলকটা তুলে দেখতে দেখতে বললেন, আহা! বড় আনন্দ হচ্ছে। বড় আনন্দ হচ্ছে। বাকি রাত আমরা গান গেয়েই কাটাব …
